কর্ণার্জুন

কথাসার।

(রামায়ণ ও মহাভারতের কথা।)

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন-সঙ্কলিত।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

CALCUTTA:

B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS,

77, PATALDANGA STREET.

1911.

Price 1 Rupee.] । মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

"ওঁ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।"

বঙ্গের সুবিখ্যাত পৌরাণিক, ঈশ্বরকল্প, স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺কৃষ্ণমোহন শিরোমণির

প্রাতঃস্মরণীয় নামে,

তদীয় অক্ষয় প্রীতিকামনায়,

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

বৈকুণ্ঠবাসিন্ দয়াময় পিতঃ!

তুমি যখন নরদেবতার কলেবরে এ অবনীতে বিদ্যমান ছিলে, এবং আমি যখন অজ্ঞানান্ধ শিশু ছিলাম, তখন বাল্যলীলাবশে কত কি ছাই মাটি লইয়া তোমার বরাঙ্গে নিক্ষেপ করিয়াছি, তুমি তাহাতেই কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ, আমাকে কোলে লইয়া কত সোহাগ করিয়াছ। আজি তুমি সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠলোকে, এবং আমি এই শোকমোহাচ্ছন্ন জীবলোকে। আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইলেও, তোমার নিকট সেই শিশুই আছি। ইহলোকে অবস্থানকালে তোমার যাহা প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থ ছিল, সেই রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটী বিষয় মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া, তোমার পাদপদ্মে অর্পণ

করিলাম। সেই পূর্ব্ব স্নেহ-মমতা স্মরণ করিয়া, তুমি এ উপহারে দৃষ্টিপাত করিলে, আমি কৃতার্থ হইব। এ গ্রন্থ সঙ্কলনকালে তোমাকেই ভাবিয়াছি, সম্মুখে তোমার সেই শান্ত-পাবনী, বিশ্বমোহিনী দেব-মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আমার আর কিছুই জ্ঞান ছিল না। দেখিয়াছি,—তুমি সেই বিশাল পুরাণ-সভার পবিত্র বেদিকায়, সাক্ষাৎ দ্বৈপায়ন-রূপে উপবিষ্ট; তোমার চতুষ্পার্শে আবালবৃদ্ধ-বনিতা অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ ও নিস্পন্দ। নিঃশব্দে সকলের কপোল বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা ঝরিতেছে। যেন একটী বিশাল বনভূমি প্রভাতে বায়ু-বিরহে নিশ্চল হইয়া আছে, আর তাহার পত্রে পত্রে শিশির ঝরিতেছে। পিতঃ! আমার মানসক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবৎ আবির্ভূত সেই দৃশ্যই আমার আদর্শপুস্তক। এ উপহারে তুমি প্রীত হইলেই আমার শ্রম সার্থক। ইতি।

ভাগ্যহীন সন্তান—

তারাকুমার—

ভূমিকা।

আমার প্রাণপ্রতিম বঙ্গীয় ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষার সাহায্য জন্য, ভারতের অক্ষয় জ্ঞান-রত্নভাণ্ডার—রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কয়েকটী বিষয় ইহাতে সঙ্কলিত হইল। ইহার সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়া আমার পুত্রকল্প, প্রেসিডেন্সি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান হেমচন্দ্র সরকারের নিকট জ্ঞাত হইলাম,—অতুলপ্রতিভারাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলর, জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়, এইরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কন্‌ভোকেসন্-সভায় একটী সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তদীয় অমূল্য মন্তব্যটী এ স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

"I have no faith in the efficacy of abstract religious maxims solemnly inculcated by grave teachers upon youthful minds which receive no impression from the process. But I believe, it would be far more profitable to illustrate the fundamental principles of every system of morals

and religion by examples of truth, purity, charity, humility, self-sacrifice, gratitude, reverence for the teacher, devotion to duty, womanly chastity, filial piety, loyalty to the King, and of other virtues appropriately selected from the great national books of Hindus and Mahomedans. These cameos of character, these ideals of our past, portrayed with surpassing loveliness in the immortal writings of our poets and sages, would necessarily captivate the imagination and strengthen the moral fibre of our youngmen, who would thus acquire genuine respect for those principles of life and conduct which have guided in the past countless generations of noble men and women in this historic continent."

সহৃদয়, সূক্ষ্মদর্শী, মনীষী আশুতোষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ দেশের শিক্ষার্থিগণের পক্ষে যেমন সুখসেব্য, তেমনি কল্যাণপ্রদ পন্থা। তাঁহার ঐ মন্তব্যই আমার এ গ্রন্থের মূলগ্রন্থি। উহাতেই দৃষ্টি রাখিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। হরিশ্চন্দ্র, নল, যুধিষ্ঠির, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রভৃতি ভারতীয় পুণ্যশ্লোকগণের চরিত্র, এবং সীতা, সাবিত্রী, সুমিত্রা, দময়ন্তী, শৈব্যা, অরুন্ধতী, অনসূয়া প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকাগণের চরিত্র, এ দেশের নর-নারীগণের হৃদয়ের ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল ও উপযোগী। পাঠদশায় সুকোমল ছাত্রহৃদয়ে ঐ সকল চরিত্রের পবিত্র প্রভাব যাহাতে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া, ছাত্রগণের জীবন-স্রোতকে শাশ্বত শ্রেয়ঃপথে প্রবর্ত্তিত করে, মহামতি আশুতোষ তাহারি

সদুপায় নিজ মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সংহিতাকার মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন ;—

"বহির্মুখাণি স্রোতাংসি কুর্য্যাদন্তর্মুখাণি হি।
তদেব জ্ঞানং শিষ্যস্য শেষস্তু গ্রন্থবিস্তরঃ॥"

অর্থাৎ—আচার্য্য, শিষ্যের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া দিবেন ; এইরূপ অন্তর্দৃষ্টি-লাভ করাই জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা। অধীত বিষয়ে যাহার অন্তর্দৃষ্টি না জন্মে, সে শিষ্য সহস্র গ্রন্থপাঠেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না। এজন্য, অধ্যয়নজনিত বিমলানন্দ-সম্ভোগে সে বঞ্চিত থাকে।

মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি এ দেশের ও অন্যান্য দেশের অসংখ্য নীতিশাস্ত্রকারেরা শ্লোক বা সুত্রাদির আকারে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে, আদর্শচরিত্র ধর্ম্মবীরগণের প্রাণস্পর্শী, অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সকল নীতির সফলতা প্রদর্শিত না হওয়ায়, ঐ সকল নীতিপ্রবচন তাদৃশ ফলপ্রদ হয় নাই।

রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়গুলি অবিকল অনুবাদ করি নাই। প্রতিপাদ্যে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজনমত পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এরূপ পরিবর্জ্জনাদি আবশ্যক। ইহার অধিকাংশ বিষয় মহাভারত হইতে গৃহীত। বস্তুতঃ মহাভারতের ন্যায় বিরাট্ ও বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না, জানি

না (১)। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর মানবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য, বহুল দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদি সহ, সংক্ষেপে ও বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহা "পঞ্চম বেদ" বলিয়া পূজিত। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে,—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" রামায়ণ ও মহাভারতের লোকপাবনী শক্তির বিষয়ে এদেশের লোকের এরূপ বিশ্বাস, যে, কেহ কোনও অপবিত্র কথা মুখে আনিলে, তৎক্ষণাৎ লোকে "রাম-রাম, মহাভারত" বলিয়া তাদৃশ অভব্য কথার শ্রবণজনিত পাপের খণ্ডন করিয়া থাকে। ফলতঃ লোকের শিক্ষণীয় ও পালনীয় এত উৎকৃষ্ট বিষয় মহাভারতে আছে, যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের আর একটী অসাধারণ গুণ এই যে, সহস্রবার পঠনে বা শ্রবণেও ইহার প্রতি লোকের অনুরাগ ও কুতূহল মন্দীভূত হয় না। সমীচীন নির্ব্বাচনপূর্ব্বক মহাভারতের কথাসকল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইলে, বঙ্গসন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যে প্রভূত সাহায্য ও মহোপকার সাধিত হয়। মনুষ্যত্বের

---

(১) সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ ব্যাস সত্যই বলিয়াছেন ;—

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা চ হিমবান্ গিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী তথা ভারতমুচ্যতে ॥"

(মহাভারত. আদিপর্ব্ব)

—অর্থাৎ, সমুদ্র ও হিমালয় যেমন অনন্ত রত্নের আকর মহাভারতও তেমনি অশেষ জ্ঞানরত্নের আধার।

উচ্চতম আদর্শকে লোকহৃদয়ে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান করিয়া দেওয়া—প্রকৃত লোকশিক্ষা। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সে উদ্দেশ্য কিয়ংপরিমাণে সিদ্ধ হইলে, আমি কৃতার্থ হইব।

অবিচ্ছিন্ন গদ্য পাঠ না করিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটী পদ্য-প্রবন্ধ-পাঠ, ছাত্রগণের রুচিকর হইবে ভাবিয়া, কতিপয় প্রবন্ধ পদ্যে লিখিত হইল (১)। ক্ষমাশীল আচার্য্যগণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন,—তাঁহারা এ পুস্তকের কোথাও ভ্রম-প্রমাদ দেখিলে কৃপা করিয়া আমাকে জানাইবেন। আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা সংশোধন পূর্ব্বক, তাঁহাদের নিকট মহোপকার-ঋণে আবদ্ধ থাকিব।

কলিকাতা।
৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
সন ১৩১৮ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) পদ্য-প্রবন্ধ পরীক্ষার্থীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য না হইলেও, তৎপাঠে হানি নাই

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

কথাসার।

রামায়ণের অবতরণিকা।

একদা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, ঋষিকুলপতি, মহাতপা, বাল্মীকি নিজ আশ্রমে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি যথাবিধি দেবর্ষির পূজা করিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ শিষ্টালাপের পর, কৃতাঞ্জলিপুটে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্বদর্শী, ত্রিলোকে আপনার অগোচর কিছুই নাই। হে মহাভাগ! অধুনা এ জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি একাধারে সর্ব্বগুণের পূর্ণপাত্র? ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি কহিলেন, এ ভুবনে সূর্য্য-বংশাবতংস মহারাজ রামচন্দ্র সর্ব্বগুণের আধার। ইহা বলিয়া তিনি বাল্মীকির নিকট রামের গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন, (১) এবং সংক্ষেপে তাঁহাকে রামচরিত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

---

(১) এস্থলে মূল রামায়ণে রামের এইরূপ গুণাবলীর উল্লেখ আছে, যথা,—ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্য, দৃঢ়ব্রত, নির্ম্মলচরিত্র,

অনন্তর, দেবর্ষি যথাবিধি পূজা লাভ করিয়া প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি, শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত স্নানার্থ তমসাতীরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, শিষ্যকে কহিলেন,—বৎস ভরদ্বাজ! দেখ! দেখ! তমসার এই ঘাটটী কি রমণীয়! এ স্থানের জল সাধুহৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল ও মনোহর। বৎস! জাহ্নবী অদূরে থাকিলেও, আজি এই তমসার ঘাটেই স্নান করিব। তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল দাও। অনন্তর তিনি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া, নদীতীরবর্ত্তী কাননের রমণীয় শোভা পরিদর্শনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদূরেই ক্রৌঞ্চমিথুন ক্রীড়াসক্ত হইয়া মধুর কূজন করিতেছিল। অহহ! এমন সময় এক ব্যাধ আসিয়া, মহর্ষির চক্ষের উপর, ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে নিপাতিত করিল। সেই বাণাহত

সর্ব্বভূতহিতে রত, বিদ্বান্, প্রজারঞ্জনাদি নিখিল রাজকর্ত্তব্যে দক্ষ, অলৌকিক প্রিয়দর্শন, আত্মজয়ী, অপূর্ব্বকান্তিশালী, অনসূয়ক, সংগ্রামে দেবগণেরও ভীতিজনক। অলৌকিকমহাপুরুষোচিত শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ব সুলক্ষণে বিভূষিত, ধর্ম্মের ও জীবলোকের রক্ষিতা, গুরুভক্ত, আশ্রিতবৎসল, বিপন্নত্রাতা, অলৌকিকপ্রতিভাশালী, বেদ-বেদাঙ্গাদি অশেষ শাস্ত্রে ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মেধাবী, পুণ্যাত্মা, সর্ব্বলোকপ্রিয়, অদীনাত্মা, সিন্ধুর ন্যায় গম্ভীর, হিমাদ্রির ন্যায় অটল, বীর্য্যে বিষ্ণুসদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নিকল্প, ক্ষমাগুণে ধরণীতুল্য, দানে কল্পতরু, চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, ইত্যাদি।

পক্ষী মৃত্তিকায় পড়িয়া, রক্তাক্ত দেহে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহার সহচরী পক্ষিণী মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বনভূমি প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই হৃদয়বিদারক-দৃশ্য-দর্শনে মহর্ষির অন্তরাত্মা কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইল। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ভেদ করিয়া, সেই করুণাই যেন "মা নিষাদ" এই শ্লোকরূপে (১) তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। মহর্ষি অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অহো! এ কি? অকস্মাৎ আমার মুখে এ অপূর্ব্ব শোকগাথা উত্থিত হইল কেন? এরূপ ছন্দ ত কখনও দেখি নাই—শুনি নাই! জানিনা বিধাতার কি ইচ্ছা। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং মুখে বারংবার ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তিনি অনন্যমনা হইয়া বারংবার ঐ শ্লোক আবৃত্তি

(১) "মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

রে ব্যাধ! কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে (পুরুষটীকে) তুই যখন হত্যা করিলি, তখন অনন্তকাল এ জগতে তুই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবি না।

Hope not, barbarian length of days to know,
Whose hand could deal so merciless a blow,
One of a harmless pair could thus destroy,
Consigned to death, amidst the thoughts of joy."

PROF. WILSON

করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণামপূর্ব্বক (১), পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দনাদি দ্বারা (২) তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। ভগবান্ কমলাসন সানন্দে তদীয় পূজা গ্রহণপূর্ব্বক আসীন হইলে, মহর্ষি কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিলেন। মুনিবরের আর কোনও দিকেই মন ছিল না, কেবল নীরবে ভাবিতেছেন,—হায় রে নিষ্ঠুর ব্যাধ! তাদৃশ ক্রীড়াসক্ত, মধুরকণ্ঠ পক্ষিটীকে তুই কোন প্রাণে বধ করিলি? আহা! সহচরের সে দশা দেখিয়া পক্ষিণী যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহা শুনিলে বজ্রও বিদীর্ণ হয়!

ব্রহ্মা তাঁহাকে অন্যমনস্ক ও চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস! আজি তোমাকে অন্যমনা দেখিতেছি কেন? তুমি বহিষ্কার্য্যে অপ্রমত্ত হইলেও, তোমার চিত্ত যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া কি ভাবিতেছ? তোমার মুখমণ্ডলে বিষাদকালিমা, তোমার

(১) 'সাষ্টাঙ্গপ্রণাম'—জানুদ্বয়, পদদ্বয়, পাণিদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, বাক্য, দৃষ্টি ও বুদ্ধি, এই আটটী দ্বারা ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করা।

(২) 'অর্ঘ্য'—দেবতা, গুরু বা অতিথির পূজাসামগ্রী। ইহাতে প্রধানতঃ আট নয়টী দ্রব্য ব্যবহার্য্য; যথা—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্রভাগ, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব, সর্ষপ ও মধু।

নয়নযুগল বাষ্পার্দ্র। যদি আমার নিকট ব্যক্ত করিতে বাধা না থাকে, তবে তোমার মনের কথা ব্যক্ত কর। বাল্মীকি এরূপ উদ্ভ্রান্তচিত্ত, যে, ব্রহ্মার কথা তাঁহার কর্ণে পশিয়াও পশিল না। সেই ক্রৌঞ্চবধশোক যেন উথলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণনাড়ী ভেদ করিয়া পুনরায় সেই শোকগাথা তাঁহার মুখ হইতে উত্থিত হইল।

ভগবান্ বিরিঞ্চি সেই অপূর্ব্ব গাথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, মহর্ষে! এ গাথা আমারি ইচ্ছায় তোমার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। যখন শোক হইতেই ইহার উৎপত্তি, তখন ইহা "শ্লোক"—নামে খ্যাত হইবে। আজি কাব্যজগতে এক অচিন্ত্যবৈভব, অভিনব ছন্দোজ্যোতি স্ফুরিত হইল। বৎস! তুমি এই ছন্দে ও এইরূপ সরল সুললিত ভাষায় সমগ্র রামচরিত রচনা কর। এই ঘটনার পূর্ব্বেই তুমি দেবর্ষি নারদের মুখে রামচরিত সংক্ষেপে যাহা শ্রবণ করিয়াছ, আমার প্রসাদে তাহা তোমার মানসে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে। দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরতাদি; কৌশল্যা সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও সীতা প্রভৃতি; হনূমান্-সুগ্রীবাদি ও রাবণ, বিভীষণ প্রভৃতি, যাহার বিষয়ে, যে ঘটনা যতই গূঢ় হউক, তোমার নিকট তাহা সূর্য্যালোকের ন্যায় সুপ্রকাশ হইবে। আমার বরে তোমার কাব্যে একটী কথাও অলীক বা ব্যর্থ হইবে না। তোমার এই অপূর্ব্ব কাব্য 'রামায়ণ' নামে জগতে বিঘোষিত হইবে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে,

যতদিন মহীতলে পর্ব্বত ও নদী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ভুবনে তোমার রামায়ণকাব্য অক্ষয় হইয়া থাকিবে। প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমার এ কীর্ত্তির বিলয় নাই। ইহা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলেন।

মহাভারতের অবতরণিকা।

পুরাকালে এই অনন্তপুণ্যাধার, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে, লোকহিতৈষী, মহর্ষিগণ লোকহিতার্থে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য পুণ্যারণ্যে বা মহাযজ্ঞে সমবেত হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (১)। তাঁহারা সংসারে লিপ্ত হইতেন না, নিঃস্বার্থ লোককল্যাণসাধনই তাঁহাদের অদ্বৈত ব্রত ছিল। একদা নৈমিষারণ্যে কুলপতি (২) শৌনক দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুরাণবক্তা, সূতকুলনন্দন উগ্রশ্রবা, নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। আসিয়া

---

(১) 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী'—দারপরিগ্রহ না করিয়া যিনি উপনয়ন হইতে মরণ পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

(২) 'কুলপতি' —যিনি দশ সহস্র মুনিশিষ্যকে গ্রাসাচ্ছাদনদানপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করান, তাঁহাকে 'কুলপতি' বলে। আশ্রমবাসী ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানকেও কুলপতি বলে।

মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

দেখিলেন,—তথায় নানা স্থান হইতে কঠোরতপা মহর্ষিগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। সৌতি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহার মুখে বিচিত্র পুরাণকথা শ্রবণ করিবার জন্য, ঋষিমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। পরস্পর শিষ্টালাপের পর, সৌতি আসন পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রাম করিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মন্! আপনি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? কোন্ কোন্ স্থানে কি কি ঘটনা দেখিয়া আসিলেন?

সৌতি কহিলেন, আমি রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ-দর্শনে (১) গিয়াছিলাম। তথায় স্বয়ং মহারাজ জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকথা শ্রবণ করিতে-ছিলেন। সেই পরম পবিত্র, অত্যাশ্চর্য্য ভারতাখ্যান আমি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। অনন্তর তথা হইতে বহু দেশ, বহু তীর্থ, নানা আশ্রম পরিদর্শন করিয়া, কৌরবগণের সংগ্রাম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। সে স্থান হইতে ভবাদৃশ পুণ্যশ্লোকগণের দর্শনকামনায় এস্থানে আসিতেছি। আপনারা সকলে পবিত্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ও আমার ঈশ্বরকল্প গুরু। স্নান, আহ্নিক ও জপ-হোমাদি সমাপন করিয়া,

---

(১) রাজর্ষি জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে তক্ষক সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, জনমেজয় সমগ্র বিষধরের ধ্বংসকামনায় এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আপনারা এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট আছেন। আপনাদের নিকট এ সময় কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব, আদেশ করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ ব্যাসদেব যে অপূর্ব্ব ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ ভক্তিভরে যাহার মহিমা উদ্‌ঘোষণ করেন, আমরা আপনার মুখে সেই পরম পবিত্র. বিচিত্র ভারতকথা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি।

মহর্ষিগণের প্রার্থনায়, পৌরাণিকগণের উপজীবা, মহাত্মা উগ্রশ্রবা, সর্ব্বাগ্রে, অনন্ত ও অপরিচ্ছেদ্য বিশ্বমণ্ডলের অনাদি-আদি—অদ্বিতীয় অধীশ্বর—সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বব্যাপী-সর্ব্বাধার—নিরাকার—নির্ব্বিকার—অবাঙ্মনসগোচর—সৃষ্টি-স্থিতিসংহারকর্ত্তা—সর্ব্বমঙ্গলনিধান—জগদীশ্বরের চরণারবিন্দে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, সেই বিশ্বপূজিত মহাযোগী বেদব্যাসের অক্ষয়কীর্ত্তি মহাভারতের অবতারণা করিলেন। তিনি প্রথমে সেই শাশ্বত, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম হইতে যেরূপে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল, এবং ক্রমশঃ তদন্তর্গত যাবতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইল, তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি মহাভারতের এক একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, এই ভারতকথা জীবগণের অশেষ কল্যাণপরম্পরার নিদান। আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-বেদনা-গ্রস্ত জীবলোকের পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শান্তিসুধার খনি। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতির সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার মানবের সর্ব্বাবস্থায় ইহা সমভাবে সেবনীয়। এ জগতে যাহা কিছু বরণীয় ও করণীয়, যাহা কিছু

সাধনীয় ও আরাধনীয়, সে সকল কথা ইহাতে অপূর্ব্ব আখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা এরূপ সুন্দরভাবে ও সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, তৎপাঠে ঐ সকল উপদেশ পাঠকমাত্রেরি হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং তৎপ্রভাবে তাহাদের জীবনস্রোত আমূলতঃ পরিশুদ্ধ হইয়া, মানবসমাজকে ধৃতপাপ ও মহোন্নত করে।

যাবৎ মানবসমাজ বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ এই বিচিত্র ইতিহাস, বরণীয় সুধীগণ কর্তৃক সাদরে অনুশীলিত ও কীর্ত্তিত হইবে। সমগ্র বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, মীমাংসা,—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি ও সে সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব ইহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যেমন এক মহাসূর্য্যের অপরিচ্ছন্ন আলোক হইতে লোক সকল গবাক্ষাদি রন্ধ্রমার্গে পরিচ্ছিন্ন আলোক গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহকে আলোকিত করে, তেমনি এই অসীম জ্ঞানাধার মহাভারত হইতে অভিমত উপাদান গ্রহণপূর্ব্বক, জগতের কবীন্দ্র ও শাস্ত্রকারগণ চিরকাল নিজ নিজ গ্রন্থকে পরিপুষ্ট ও অলঙ্কৃত করিবেন।

ভগবান্ দ্বৈপায়ন এই পরমাদ্ভুত, লোকপাবন ইতিহাস রচনা করিয়া চিন্তা করিলেন,—কিরূপে ইহা শিষ্যগণমধ্যে প্রচার করি। যথায় বিশ্বজনীন সাধু সংকল্প, তথায় বিধাতার প্রত্যক্ষ কৃপা। ব্যাসের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বৈপায়ন তাঁহাকে দর্শন

করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া, আসনে উপবেশন করাইলেন। পশ্চাৎ তদীয় আজ্ঞায় স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! আমি ভবদীয় কৃপাবলে যে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে মনে মনে এক পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি। ইহাতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ক অখিল তত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, উপাখ্যান, সংবাদ, প্রবচন, অনুশাসন, গীতা, গাথা প্রভৃতি সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। দেশকালপাত্রভেদে সকলের সকল প্রকার কর্ত্তব্য ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমার স্মৃতিপথেই রহিল, উপযুক্ত লেখকের অভাবে লিপি-বদ্ধ হইল না। বিধাতা বলিলেন,—জাগতিক রহস্যজ্ঞানে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন পুণ্যতম গৃহস্থাশ্রম সমস্ত আশ্রমের উপজীব্য, তেমনি তোমার এ কাব্য যাবতীয় কাব্যের উপজীব্য। তুমি এক্ষণে দেবাগ্রগণ্য, গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার কাব্যের লেখক হইবেন। ইহা বলিয়া ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন।

ভক্তপ্রিয় গণপতি স্মরণমাত্র ব্যাসসকাশে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রণত মুনিবরের যথাবিধি পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে, ব্যাসদেব নিবেদন করিলেন,—প্রভো! আমি মনে মনে মহাভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। আমি মুখে মুখে উহা আপনার নিকট বলিয়া যাইব, আপনাকে কৃপা করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ যথাযথ লিখিয়া

যাইতে হইবে। ব্যাসের এই আবেদন শুনিয়া, গণেশ কহিলেন,—হে মহর্ষে! আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে, আমার লেখনী বিশ্রাম করিবে না। যদি তোমার বলিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমি লিপিকার্য্যে বিরত হইব। ব্যাসও কহিলেন,—কিন্তু আমি যাহা বলিব, আপনি স্বয়ং তাহার অর্থবোধ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণেশও তথাস্তু বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্যই মহর্ষি ব্যাস কৌতুক করিয়া মহাভারতের স্থানে স্থানে কূটার্থ শ্লোকগ্রন্থি রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন,—আমার এই গ্রন্থে এরূপ অষ্টশত গূঢ়ার্থ শ্লোক আছে যে, সে সকলের অর্থ কেবল আমার ও শুকদেবের বোধগম্য; অন্যের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বার্থদর্শী স্বয়ং সঞ্জয়ও তাহা বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ সে সকল কূটার্থ শ্লোকের সমীচীন ব্যাখ্যা অদ্যাপি কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। যে যে স্থলে ব্যাসকে একটু ভাবিয়া বলিতে হইত, সেই সেই স্থলে তিনি এরূপ দুই একটী শ্লোক বলিতেন, যে তাহার অর্থগ্রহ করিতে গণেশকে লেখনী রাখিয়া ভাবিতে হইত। ব্যাসও সেই অবসরে মনে মনে বহু শ্লোক রচনা করিতেন।

গুরুভক্তি, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ।

অর্জ্জুন।

দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র দরিদ্র। তাঁহার পরিবারের মধ্যে এক-মাত্র জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র অশ্বত্থামা। দ্রোণ ভগবান্ পরশুরামের নিকট সমস্ত সমগ্র অস্ত্রবেদ লাভ করিয়াছিলেন। নরলোকসুদুর্লভ অশেষ দিব্যাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি জীবিকার জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদা শুনিলেন,— মহাত্মা ভীষ্মদেব, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদি পৌত্রগণের অস্ত্র-শিক্ষার জন্য, উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণ করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহার যথাবিধি সম্মান করিয়া, তদীয় হস্তে কুমারগণের শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। দ্রোণও পরমাদরে তথায় বাস করত, কুমারগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অচিরেই তদীয় বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইল। অন্যান্য স্থানের রাজপুত্রেরাও আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। গুরুভক্তি, অধ্যবসায়, সত্য-নিষ্ঠা ও সংযমশীলতা প্রভৃতি গুণে অর্জ্জুনই তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য হইলেন। আচার্য্য নানা কৌশলে অর্জ্জুনের বুদ্ধি-পরীক্ষা করিয়া, তদীয় বিদ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেন।

আচার্য্য, অর্জ্জুনকে কদাচ অন্ধকারে ভোজন করিতে দিতেন না। এজন্য অর্জ্জুন অন্ধকারে ভোজন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। একদিন তিনি রাত্রিকালে আহারে বসিয়াছেন,

এমন সময় বায়ুভরে তত্রত্য প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সে স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তিনি আহারে ক্ষান্ত হইলেন না। সেই গাঢ় অন্ধকারে তাঁহার হস্ত, অন্ন সহ মুখেই উঠিতে লাগিল। অর্জ্জুন ভাবিলেন,—অন্ধকারে আমি না দেখিলেও, আমার হস্ত আমার মুখেই উঠিতেছে, অন্য দিকে যাইতেছে না। এ শুধু আমার অভ্যাসের ফল। অতএব, যদি অভ্যাস করি, তবে অন্ধকারে না দেখিয়াও পূর্ব্বানুভূত লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিব। চিত্তের একাগ্রতা ও অভ্যাস, সিদ্ধিলাভের উপায়। তদবধি তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও বিষয় ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, সকল কার্য্যই তিনি সমান যত্নে ও অভিনিবেশসহকারে সম্পন্ন করিতেন। সামান্য সামান্য বিষয় হইতেও, তিনি অসামান্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। বিখ্যাত নীতিবেত্তা চাণক্য বলিয়াছেন,—"ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, যখনি যে কার্য্য পড়িবে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নেই সম্পন্ন করা উচিত।" সকলি অভ্যাসসাপেক্ষ। সমাধি ও অভ্যাস প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনুশীলিত হইলে ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ে উহা স্বতই সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। যাহার নিকট ক্ষুদ্র বিষয় উপেক্ষিত হয়, অভ্যাসদোষে তাহার নিকট বড় বিষয়ও উপেক্ষিত হয়। অভ্যাসযোগ শুধু ঐহিক সৌভাগ্যের নিদান নহে, ইহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সৌভাগ্যই লাভ করা যায়।

গভীর নিশীথে যখন সমস্ত জগৎ প্রসুপ্ত ও নিঃশব্দ, তখনও অর্জ্জুন-শরাসনের টঙ্কারধ্বনি শ্রুত হইত। তাঁহার শিক্ষার বিরাম নাই, দিবা-রাত্রি জ্ঞান নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্বোধ নাই, কেবল বিদ্যাই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, জপমালা। তিনি অল্পকালেই, অন্ধকারে লক্ষ্যবেধে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার এরূপ গুরুভক্তির প্রভাব, যে, দ্রোণাচার্য্য যে সকল গুহ্য দিব্যাস্ত্রবিদ্যা নিজ প্রাণাধিক পুত্র অশ্বত্থামাকেও দেন নাই, সে সকল বিদ্যাও তিনি যোগ্য শিষ্য বলিয়া তাঁহাকেই দিয়াছিলেন। গুরুজনের আজ্ঞাবহ, বিনীত ও শুশ্রূষু হইয়া অশ্রান্ত যত্ন, অবিচলিত অধ্যবসায় ও একান্ত ভক্তিযোগে বিদ্যালাভে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই শিষ্য গুরুর নিকট বিদ্যালাভে সফলকাম হয়। কেবল সাধনার বলে এ জগতে অদ্ভুত কার্য্য-সকল সম্পন্ন হয়, অসাধ্যও সাধ্য হয়। ইহার একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

দ্রোণগুরুর অস্ত্রবিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হওয়ায়, নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা আসিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন। একদা একলব্য নামে এক চণ্ডালপুত্র অস্ত্রবিদ্যা-লাভের আশায় তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু সে হীন জাতি বলিয়া, আচার্য্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া, দ্রোণচরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপে পারি, আমি দ্রোণগুরুর অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিবই, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে, একদা দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুনাদি সমস্ত শিষ্যগণ সহ, মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে অকস্মাৎ এক ভীষণ কুক্কুর চিৎকার করিতে করিতে সেই দিকে আসিতে লাগিল। পরক্ষণেই অলক্ষ্য হইতে সাতটী বাণ আসিয়া সেই সারমেয়ের বদনে সংলগ্ন হইল। শরগুলি ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়া রহিল। অলক্ষ্য হইতে কুক্কুরমুখে ঐরূপ আশ্চর্য্য শরক্ষেপ দর্শন করিয়া দ্রোণ-শিষ্যগণ অবাক্ হইলেন। যিনি দূর হইতে শব্দমাত্র শুনিয়াই অদৃষ্ট লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিলেন, তাঁহারা সহস্রমুখে সেই লক্ষ্য-বেদ্ধার বিদ্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণ-শিষ্যেরা সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বীরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এক স্থানে দেখিলেন,—এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নির্জ্জনে একাকী বসিয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মলাকীর্ণ, পরিধেয় কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাজূট। সে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অবিশ্রান্ত শরাভ্যাস করিতেছে। কঠোর পরিশ্রমে ও চিরসঞ্চিত পঙ্কমলাদিসংযোগে তাহার দেহ এরূপ বিকৃত, যে, দেখিলে মানুষ বলিয়া জ্ঞান হয় না। সকলে সাগ্রহে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল,—আমি নিষাদপতি হিরণ্যধনুর পুত্র। ভোগলালসা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, আমার এই অভীষ্ট বিদ্যা অভ্যাস করিতেছি। আমি ভগবান্ দ্রোণগুরুর শিষ্য। তাঁহারি কৃপায় আমি অস্ত্রবিদ্যায় এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি।

তাহার ঐ কথা শুনিয়া, কৌরবেরা গিয়া দ্রোণাচার্য্যকে

সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুন অভিমানভরে গুরুদেবকে কহিলেন,—পিতঃ! এই বুঝি আমার উপর আপনার সর্ব্বাধিক স্নেহ? আমার অজ্ঞাত গুহ্য বিদ্যাসকল আপনি আমাকে না দিয়া অন্যকে দান করিয়াছেন। আপনি বলিয়া থাকেন,—বৎস! তোমা অপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য আমার আর কেহ নাই। এখন দেখিতেছি, ঐ চণ্ডালপুত্র আমা-অপেক্ষা আপনার অধিকতর স্নেহাস্পদ। নহিলে, আপনি আমাকে বঞ্চিত করিয়া, এ বিদ্যা উহাকে শিখাইলেন কেন? দ্রোণাচার্য্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া সেই নিষাদের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, নিযাদ তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া, শিরে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণগুরুর পদতলে পতিত হইল, এবং তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া, আদেশপ্রতীক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল। দ্রোণ জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? কাহার নিকট এই অলৌকিকী বিদ্যা লাভ করিয়াছ? সে কহিল, আমি নিষাদ, অমার নাম একলব্য। হে দেব! এ দাস আপনার শিষ্য। আমি আপনার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলাম। আপনি, হীন জাতি বলিয়া আমাকে প্রত্যাখ্যান করায়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—আপনাকেই আমার গুরুপদে বরণ করিয়া, অস্ত্রবেদ শিক্ষা করিব। আমি আপনার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আপনারি মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলাম। কঠোর সংযম পালনপূর্ব্বক, অহরহঃ ঐ মূর্ত্তিকেই আমি পূজা

করি। গুরুপাদপদ্মই আমার ধ্যান ও ধারণা, উহাই আমার সাধন ও ভজন। গুরুই আমার সর্ব্বেশ্বর। আমি আর কিছুই জানি না। হে দেব! এ দাস যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহা আপনারি শ্রীচরণপ্রসাদে।

নিষাদতনয়ের সেই কথা শুনিয়া দ্রোণ কহিলেন,—যদি আমিই তোমার গুরু হই, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দান কর। সে তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা দিব? দ্রোণ কহিলেন,—তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া আমাকে দাও। দ্রোণের সেই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শুনিয়া, গুরুভক্ত, সত্যপরায়ণ নিষাদ অম্লানমুখে নিজ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া পুলকিতচিত্তে তাহা গুরুপদে অর্পণ করিল। তাহার সেই লোমহর্ষণ কার্য্যদর্শনে সকলে চমকিত হইলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—এ ব্যক্তি হীনজাতি হইয়াও যে সাধনা, গুরুভক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিল, তাহা সকলের শিক্ষণীয়।

দ্রোণশিষ্যগণের মধ্যে অর্জ্জুনই গুরূপদেশ পূর্ণমাত্রায় ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি, গুরুকৃপায় ও তপস্যায় যে সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটীমাত্র প্রয়োগ করিলে, কুরুক্ষেত্রের সে একাদশ অক্ষৌহিণী রিপু-বাহিনী পলকেই রসাতলে যাইত। কিন্তু সংযমী, ধর্ম্মবীর ধনঞ্জয় সে সকল অস্ত্রের একটীও প্রয়োগ করেন নাই! ঘোর

সঙ্কটের সময়ে লোকের ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা বিলুপ্ত হয়, তখনও যিনি নিজ প্রকৃতির সাম্য রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই বীর-পুরুষ। এমন সংযমী ও সত্যনিষ্ঠ না হইলে, তিনি ভগবানের প্রেমাস্পদ হইবেন কেন?

একলব্যের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া, অর্জ্জুনের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। অর্জ্জুন তদবধি অধিকতর যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি শরক্ষেপে এরূপ ক্ষিপ্রহস্ত হইলেন যে, তাঁহার শরাসন নিয়ত মণ্ডলাকারে অবিচ্ছিন্ন ধারায় শরবর্ষণ করিত। তিনি উভয়হস্তে তুল্যরূপে শরক্ষেপ করায়, 'সব্যসাচী' নামে খ্যাত হইলেন।

যথাবিধি কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, দ্রোণ, শিষ্যগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুমারগণের পরীক্ষার জন্য সুপ্রশস্ত রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাতে তাহা সুসজ্জিত হইল। সমস্ত রাজপরিবার সহ কুরুবৃদ্ধেরা ও অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী তথায় সমবেত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তথায় একটী অত্যুচ্চ বৃক্ষের শীর্ষদেশে একটী কৃত্রিম পক্ষী স্থাপন করিলেন। তিনি কুমারগণকে বলিলেন,—তোমরা ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্তুত হও। আমি যখনি আজ্ঞা করিব, তখনি বাণ দ্বারা ঐ কৃত্রিম পক্ষীর মস্তক ছিন্ন করিও। কুমারেরা ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্তুত হইলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—তুমি ধনুর্ব্বাণ সজ্জিত করিয়া ঐ লক্ষ্য দর্শন কর। আমি

আজ্ঞা দিবামাত্র শরক্ষেপ করিও। যুধিষ্ঠির ধনুর্বাণ লইয়া সেই পক্ষীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ কহিলেন,—কেমন, তুমি ঐ লক্ষ্য দেখিতেছ ত? যুধিষ্ঠির বলিলেন;—হাঁ, দেখিতেছি। দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসিলেন;—তুমি ঐ বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে দেখিতেছ, বা বৃক্ষকে দেখিতেছ, অথবা আমাকে বা তোমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি এ স্থানে সকলকেই দেখিতেছি। দ্রোণ মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—তুমি যাও, তোমাকে লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে না। এইরূপে তিনি একে একে সকল শিষ্যকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। সকলেই পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর দান করিল। অনন্তর তিনি, তথায় সমাগত অন্যান্য ধনুর্ধারীকেও ঐরূপ প্রশ্ন করায়, তাহারাও ঐরূপ উত্তর দিল। অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ লইয়া গুরুদেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। আচার্য্য স্মিতমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন,—বৎস! তুমি কি দেখিতেছ? ঐ বৃক্ষ, ঐ পক্ষী ও ইতস্ততঃ অন্যান্য পদার্থ, ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টী দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি ঐ পক্ষীই দেখিতেছি। আর কোনও পদার্থেই আমার দৃষ্টি নাই। দ্রোণ বলিলেন,—তুমি কি ঐ পক্ষীর সর্ব্বাঙ্গ দেখিতেছ? অর্জ্জুন কহিলেন,—না দেব! ঐ পক্ষীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। দ্রোণ বলিলেন—তবে বাণ মোচন কর। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ বাণদ্বারা সেই পক্ষীর মস্তক ছিন্ন করিলেন।

লক্ষ্যবিষয়ে স্থিরদৃষ্টি ও তন্ময় ছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুন

বিশ্বজয়ী বীর হইয়াছিলেন। একদা দ্রোণ শিষ্যগণ সহ গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। দ্রোণ গঙ্গাজলে নামিলে, এক ভীষণ কুম্ভীর জলমধ্যে তাঁহার জঙ্ঘা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সেই জলচরকে স্বয়ং বধ করিতে সমর্থ হইয়াও, তাহা করিলেন না, একে একে শিষ্যগণকে তাহার প্রাণসংহারের আদেশ করিলেন। জলমগ্ন সেই অদৃশ্য জলচরকে কেহই বধ করিতে পারিল না। তখন তিনি অর্জ্জুনকে আজ্ঞা করিবামাত্র, অর্জ্জুন শরাঘাতে সেই অলক্ষ্য জলচরকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। দ্রোণ অর্জ্জুনের পৌরুষে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রৈলোক্যসংহারক্ষম ব্রহ্মশিরোনামক দিব্যাস্ত্র দান করিলেন, এবং কহিলেন,—বৎস! এ অস্ত্র কদাপি মর্ত্ত্যলোকের কাহারও উপর প্রয়োগ করিও না। দেবদানবাদি দুর্জ্জয়, অমানুষ শত্রু তোমাকে আক্রমণ করিলে, তাহার উপর ইহা প্রয়োগ করিও। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বা অন্যান্য মহা-সঙ্কটেও, অর্জ্জুন তাহা প্রয়োগ করেন নাই। বিপদেও এরূপ প্রলোভন সংবরণ করা প্রকৃত মহত্ত্ব।

দ্রুপদরাজতনয়া কৃষ্ণার স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যভেদ অর্জ্জুনের মহতী কীর্ত্তি। সেই স্বয়ংবরে দ্রুপদরাজের আহ্বানে, নানা স্থান হইতে অসীম জনকল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকল দেশের রাজ-রাজেন্দ্রগণ, রথী, মহারথী প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ, যোগী, ঋষি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, এবং নানাজাতীয় দর্শকবৃন্দ ও নট, নর্ত্তক, বৈতালিক, শিল্পী প্রভৃতিরা

কৌতূহলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরবহির্ভাগে বিশাল স্বয়ংবরসভা নির্ম্মিত। প্রাকার-পরিখা-তোরণ-বিতান, ধ্বজ-পতাকা ও বিচিত্র পুষ্পমালায় সে স্থান সুসজ্জিত হইল। চন্দনোদকসিক্ত, অগুরুধূপাদি-সুবাসিত, অপূর্ব্ব-কারুকার্য্যখচিত, সুশোভন হর্ম্ম্যমালায়, রত্নবেদিকায় ও মণিকুট্টিমে সে স্থান দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। সভার মধ্যস্থলে লক্ষ্য স্থাপিত। অতি ঊর্দ্ধদেশে একটী চক্রাকার যন্ত্র ঘুরিতেছিল। সে যন্ত্রের মধ্যে একটী ছিদ্র। দ্রুপদের স্থাপিত অনম্য ও দুর্ভর কার্ম্মুকে এককালে পঞ্চবাণ সন্ধান-পূর্ব্বক, যিনি সেই ছিদ্রপথ দিয়া, সেই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, ভুবনমোহিনী দ্রৌপদী তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। কিন্তু সে কার্ম্মুকে জ্যারোপণ করা দূরে থাক, অনেকে তাহা উত্তোলনও করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ তাহা উত্তোলন করিলেন, কিন্তু জ্যারোপণে অত্যধিক বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সমবেত বীরগণ লক্ষ্যভেদে অক্ষম হইয়া অধোবদন হইলেন।

কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা তৎকালে তত্রত্য এক কর্ম্মকারের গৃহে, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা তথায় ভিক্ষা দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন, তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় কেহই জানিত না। কুতূহলী হইয়া তাঁহারাও স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্যভেদে সকলকে অসমর্থ দেখিয়া, অগ্রজের ইঙ্গিতে ছদ্মবেশী ধনঞ্জয় অগ্রসর হইলেন। তিনি

ভক্তিভরে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের ও গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, অবলীলাক্রমে বাম হস্তে সেই দুর্ভর ধনু গ্রহণ করিলেন এবং নিমেষমাত্রে তাহাতে পঞ্চবাণ যোজনা করিয়া সেই অভেদ্য লক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতিত করিলেন। বিস্মিত দর্শকমণ্ডলী হইতে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি অর্জ্জুনের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু সমবেত সেই সসৈন্য রাজমণ্ডল, পরাভবজনিত রোষে প্রজ্বলিত হইয়া, লক্ষ্যবেদ্ধা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা এবং কর্ণ, শল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি বীরকেশরীরা সসৈন্যে সেই লক্ষ্যবেদ্ধার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গাণ্ডীবীর ভুজবীর্য্যে সকলে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়তার ও ধর্ম্মার্থে আত্মত্যাগের ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে কতিপয় ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। পাণ্ডবেরা যখন রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী, তখন অর্জ্জুন ব্যাসদেবের আদেশে সুরলোকে সুরনাথের নিকট দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় সংযতচিত্তে কঠোর সাধনায় সুরপতির নিকট নানা দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা সুরাঙ্গনা ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী রজনীযোগে অর্জ্জুনের নকট গিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্জ্জুন ধর্ম্মমার্গে অচল ও অটল। তিনি উর্ব্বশীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তাঁহাকে তদনুরূপ ভক্তি ও সম্মান

প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। প্রকৃত বীরপুরুষের নিকট জগতের সমস্ত প্রলোভনই তুচ্ছ। চিত্তবিকারের সহস্র প্রবল কারণ সত্বেও যিনি অবিকৃতচিত্ত, তিনিই বীর।

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ হইলে, তাঁহারা দেবর্ষি নারদের আদেশে পরস্পর এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, যে, দ্রৌপদী পর্য্যায়ক্রমে এক এক বর্ষ এক এক ভ্রাতার পত্নী হইবেন। যখন যাঁহার পর্য্যায় আসিবে, তখন তিনি দ্রৌপদীর সহিত বিজনে একাকী থাকিলে, যদি অন্য ভ্রাতা সেস্থানে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাকে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে বাসকালে, একদা একদল দস্যু আসিয়া তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিল। ঐ গোধনই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহাত্মন! নৃশংস দস্যুরা আসিয়া আমার সমস্ত ধেনু হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমার গোধন মোচন করুন, আমার সর্ব্বনাশ হইল। বিপন্ন ব্রাহ্মণের কাতর বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভয় দান করিলেন। তাঁহার ধনুর্ব্বাণ যে গৃহে ছিল, সে গৃহে তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত বিজনে অবস্থান করিতেছিলেন। সে গৃহে তখন প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ গৃহত্যাগী হইতে হইবে। কিন্তু তিনি পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।

এ কার্য্যের জন্য দ্বাদশ বর্ষ গৃহত্যাগ তাঁহার নিকট তুচ্ছ কথা। অর্জ্জুন ভাবিলেন,—বিপন্নের অশ্রুমার্জ্জন করাই আমার সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। এ কার্য্য না করিলে আমার ক্ষত্রিয়নামে ও অস্ত্রবিদ্যায় ধিক্! যদি এই রোরুদ্যমান শরণার্থীর বিপদুদ্ধার না করি, তবে আমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে। ধর্ম্ম-পালনের জন্য সহস্র মৃত্যুও স্বীকার্য্য।

এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি অবিলম্বে সে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া বায়ুবেগে দস্যুদলের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার ভুজবীর্য্যে সমস্ত দস্যু নিহত হইল। তিনি সানন্দে সমস্ত গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া জননীর ও অগ্রজদ্বয়ের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য দ্বাদশ বর্ষ গৃহত্যাগের অনুমতি চাহিলেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের সেই বজ্রপাতসম নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে বলিতেছি যে,—যে প্রয়োজনে তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে তোমার বিন্দুমাত্র দোষ হয় নাই। আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্যও করা হয় নাই। আমি নির্ম্মল চিত্তে বলিতেছি,—তুমি অপরাধী নহ। সস্ত্রীক উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠের গৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশে দোষ হয় না। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে জ্যেষ্ঠের প্রবেশই দূষণীয়। হে বীর! তুমি ক্ষান্ত হও, আমার কথা রক্ষা কর। তোমরা কখনও আমার অবাধ্য নহ।

অর্জ্জুন অগ্রজের বাক্য শুনিয়া, সরোদনে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, এবং কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি আমার পরম গুরু, আমাকে এ অনুরোধ করিবেন না। যে কার্য্যে অণুমাত্র ছিদ্র বা ছল আছে, যাহা করিলে নিজের ভীরুতা বা কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে, এবং আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইবে, আমি প্রাণান্তেও তাহা করিব না। আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, আমি আমার আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি (১)। আপনারা প্রসন্ন মনে আমাকে অনুমতি দিন। অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া, সকলেই নিরুত্তর হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সকলের অনুমতি লইয়া, গুরুজনগণকে ভক্তিভরে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রবাসযাত্রা করিলেন।

অর্জ্জুনের ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও গুরুভক্তি অত্যাশ্চর্য্য। যখন রাজা যুধিষ্ঠির বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হন, এবং শেষে পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী দ্রৌপদীকেও পণ রাখিয়া পরাজিত

(১) "আমি এই সত্য করিতেছি" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণেরা শপথ করিবে। যুদ্ধের বাহন অশ্ব বা গজ, অথবা ধনুর্ব্বাণ-খড়্গাদি শস্ত্র স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়েরা শপথ করিবে। বৈশ্যেরা ধেনু, ধান্য ও স্বর্ণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিবে। এবং শূদ্রেরা সর্ব্ববিধ পাপের নাম করিয়া শপথ করিবে।

"সত্যেন শাপয়েদ্‌ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥"

(মনু)

হন, এবং সেই জনতাপূর্ণ প্রকাশ্য রাজসভায়, পাপিষ্ঠ দুঃশাসন, একবস্ত্রা, কুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার উপর বীভৎস অত্যাচার করে, তখন তেজস্বী ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুধীর, ধর্ম্মাত্মা, গুরুভক্ত, অর্জ্জুন ভীমসেনকে শান্ত করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের বিনীত ও নীতিগর্ভ উপদেশে ভীম শেষে লজ্জিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের চরণে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

মহাভারতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির "ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ" বলিয়া কীর্ত্তিত। স্বয়ং ঈশ্বর সেই মহাবৃক্ষের মূল। বস্তুতঃ যাঁহার জীবনপ্রণালী ঈশ্বরমূলে প্রতিষ্ঠিত, যিনি সেই সত্য-শিব-সুন্দর শাশ্বত পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ দর্শন করিয়া, সেই মহাপ্রেমের আদর্শে আত্মাকে গঠিত করিতে পারেন, তাঁহার প্রতি কেহ সহস্র পাপাচরণ করিলেও, তিনি তাহার প্রতি নিষ্পাপ; তিনি নিষ্ঠুরভাষীর প্রতি সদাই প্রিয়ংবদ; তাঁহার অন্তরাত্মা বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত। অর্জ্জুন সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত ভ্রাতা। যখন দুর্য্যোধনাদির ষড়যন্ত্রে পাণ্ডবেরা রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী, সে সময় একদা দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিজ ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব প্রদর্শন দ্বারা পাণ্ডবদিগকে সন্তাপিত করিবার অভিপ্রায়ে, ঘোষযাত্রা-ব্যপদেশে (১) সমস্ত পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব ও

(১) পূর্ব্বকালে গোধনই ভারতের প্রধান সম্পত্তি। রাজারা বর্ষে বর্ষে স্বাধিকারস্থ গোধনের পরিদর্শন ও সংখ্যাদি নিরূপণ

সৈন্যসামন্তাদি সহ মহাসমারোহে বনবাসী পাণ্ডবগণের সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা অভীষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া, মহোল্লাসে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। সে স্থানটী চিত্রসেন নামক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজের অধিকৃত এবং গন্ধর্ব্বগণের ক্রীড়াস্থান। তথায় কৌরবগণের দৌরাত্ম্যে গন্ধর্ব্বরাজ কুপিত হইয়া যুদ্ধে কৌরবগণকে পরাভূত করিলেন, এবং সসৈন্য ও সপরিবার দুর্য্যোধনকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। কৌরবপরিবারের আর্ত্তনাদে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। অদূরেই পাণ্ডবেরা বাস করিতেছিলেন। কৌরবগণের এই বিপদের সংবাদে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া সকলকে উদ্ধার কর। শত্রুরা সহস্র অপকার করিলেও, তাহাদের বিপদের সময় সে কথা মনে করিতে নাই, প্রাণ দিয়াও তাহাদের বিপদুদ্ধার করা উচিত। বিশেষতঃ যদি কোনও বহিঃশত্রু আসিয়া জ্ঞাতিগণকে পরাভূত করে, তখন

করিতেন, এবং গোজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষবিধানের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতেন। সুবিশাল নদীপুলিনে বা অন্য কোনও সুপ্রশস্ত জলতৃণাদিপূর্ণ স্থানে গোপগণ গোসকলকে আনয়ন করিত। রাজপুরুষেরা গোবৎসগণের গাত্রে এক একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন। এই চিহ্নদানের নাম "বৎসাঙ্কন"। সপরিবার রাজা, রাজপুরুষগণ ও অন্যান্য লোকসকল তথায় মিলিত হইত। সকলে গোজাতির প্রিয় বহুবিধ ভক্ষ্য ও পানীয়দানে গোগণকে পরিতৃপ্ত করিত, এবং রাজায় প্রজায় মিলিত হইয়া মহোৎসবে মগ্ন হইত। এই উৎসবের নাম "ঘোষযাত্রা"।

আর গৃ[illegible] কথা মনে আনিতে নাই। সে পরাভব ও অবমানকে [illegible]ন আত্মাবমান মনে করিতে হইবে। অর্জ্জুন নির্ব্বিকারচিত্তে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন, এবং দ্রুতবেগে গিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ গন্ধর্ব্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, কৌরবগণকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর সরল ও মধুর ব্যবহারে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে, অরণ্যে, রণস্থলে, সর্ব্বত্রই অর্জ্জুন-মহত্ত্বের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অগণিত রথ, অতিরথ, সৈন্য, সামন্ত প্রভৃতি যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন। ক্ষত্রিয়গণের সেই ভৈরব আহবে ভারতের ও অন্যান্য দ্বীপের প্রায় সমস্ত ভূপালগণ সসৈন্যে কেহ দুর্য্যোধনের, কেহ বা যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করায়, বহুদূর বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র অসীম সৈন্যসাগরে উচ্ছলিত হইল। অর্জ্জুন তথায় পিতৃপিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, শ্যালক, জ্ঞাতি, বন্ধু প্রভৃতিকে যুদ্ধার্থী দেখিয়া, করুণার্দ্র হৃদয়ে গভীর বিষাদে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! প্রাণপ্রতিম স্বজনগণকে এস্থানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন ও মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক হইতেছে। সুতীব্র সন্তাপে আমার গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে। আমার দেহ কম্পমান ও লোমাঞ্চিত হইতেছে। আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, আমি আর বসিতে পারিতেছি না। অহহ! ছার রাজ্যের জন্য এতগুলি জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মীয় হত হইবে! সহস্র সহস্র

পরিবারকে অনাথ হইয়া ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইবে! অসহায় স্ত্রী-পুত্র-বাল-বৃদ্ধ প্রভৃতির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে দশদিক্ বিদীর্ণ হইবে! লোকাকীর্ণ, সুসমৃদ্ধ জনপদসকল শ্মশানে পরিণত হইবে! যুদ্ধে জয়ী হইয়া, এ রাজ্যলাভ করিলেও আমরা শান্তি পাইব না। ইহা অপেক্ষা অকিঞ্চন ও কৌপীন-ধারী হইয়া অরণ্যবাস বা ভিক্ষা দ্বারা প্রাণধারণ করা শ্রেয়।

হে কেশব! চতুর্দ্দিকে ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এ স্বজনসংহারী যুদ্ধে আমি মঙ্গল দেখি না। হে কৃষ্ণ! আমার আর জয়লাভের বাসনা নাই। এ রাজ্যসুখ আমি চাহিনা। হে গোবিন্দ! রাজ্য, ভোগ, সুখ যাহাদের জন্য, আমার সেই প্রাণের আত্মীয়েরাই যদি যুদ্ধে হত হইলেন, তবে রাজ্যসম্পদ কাহার জন্য? এ জগতে যাঁহারা আমার ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহের আলম্বন, সেই আচার্য্য, বন্ধু ও পুত্রস্থানীয় স্নেহাস্পদগণকে সংহার করিলে যদি ত্রৈলোক্যের রাজলক্ষ্মীও আমার হস্তগত হয়, আমি তাহা চাহি না। যদিও এই সমবেত যুদ্ধার্থীরা মোহে অন্ধ হইয়া, এ স্বজননাশ ও কুলক্ষয়জনিত মহাপাপের ফল বুঝিতেছে না, তাহা বলিয়া, আমি বুঝিয়াও এ অকার্য্য হইতে কেন না ক্ষান্ত হইব? এইরূপ বলিতে বলিতে অর্জ্জুন শোকে বিহ্বল হইয়া ধনুর্ব্বাণ-পরিত্যাগপূর্ব্বক নয়নবারি মোচন করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুপক্ষের সে লোমহর্ষণ অত্যাচারসকল তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

যেমন পরম কারুণিক ভগবান্ বাল্মীকির ক্রৌঞ্চবধদর্শন-

জনিত শোকোচ্ছ্বাস হইতে ভুবনপাবনী রাময়ণকথার সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বপ্রেমিক অর্জ্জুনের ভ্রাতিবধচিন্তাজনিত গভীর বিষাদ হইতে, ধর্ম্মজগতের সারসর্ব্বস্ব গীতারহস্যের সৃষ্টি হইল। (১)

সতীধর্ম্ম।

সীতা ও অনসূয়া।

বনবাসকালে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভগবান্ অত্রিমুনির তপোবনে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা মহর্ষি অত্রি ও তৎপত্নী অনসূয়া দেবীর চরণবন্দনা করিলে, মহর্ষি তাঁহাদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া, বৃদ্ধা তাপসী পত্নী অনসূয়াকে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি সীতাকে যথোচিত স্নেহ ও যত্ন কর। অনন্তর রামকে কহিলেন, ইনি আমার পত্নী, মহাপ্রভাবা অনসূয়া। এস্থানে একদা অনাবৃষ্টি হওয়ায়, লোকসকল ফল-মূল, শাক-শস্য ও জলের অভাবে যাতনায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিল। অনসূয়া নিজ তপোবলে এ স্থানে গঙ্গাকে প্রবাহিত ও ফলমূলাদির সৃষ্টি করিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। অনসূয়ার পুণ্যপ্রভাবে এ স্থানের সমস্ত বিঘ্ন নিরাকৃত হওয়ায়,

---

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বন্ধু অর্জ্জুনের বিষাদের কারণ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাকে সময়োচিত কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিবার জন্যই তাঁহার নিকট গীতারহস্য বিবৃত করেন।

জীবগণ পরমসুখে বাস করিতেছে। ইহাঁর তপোবলে অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সকল সম্পন্ন হয়। ইনি সর্ব্বজীবের জননী-তুল্যা এবং সর্ব্বভূতের বন্দনীয়া। সীতা ইহাঁকে মাতার ন্যায় দর্শন করুন। রাম তৎক্ষণাৎ সীতাকে কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি পূজনীয়া অনসূয়াদেবীর যথোচিত সম্মান কর।

কীর্ত্তিমতী সীতা শুনি রামের বচন,
অনসূয়া-সমীপে চলিলা সেইক্ষণ।
ধর্ম্মশীলা মুনিপত্নী, তাপসীর বেশ,
প্রাচীন বয়সে শিরে শোভে শুভ্র কেশ।
শিথিল বলিত দেহ জরায় জর্জ্জর,
বাতে কদলীর সম কাঁপে থর থর।
শম-দম গুণাধার অনসূয়া সতী,
তাঁর পদে প্রণমিলা সীতা গুণবতী;
করযোড়ে ভক্তিভরে হইয়া প্রণতা,
জিজ্ঞাসিলা তাপসীর কুশল বারতা।
সীতারে কহিলা বৃদ্ধা মধুর বচনে,—
বড় ভাগ্যবতী গো মা! তুমি এ ভুবনে;
পরিহরি ধন, মান, গৃহ, বন্ধুজনে,
আসিয়াছ পতি-সনে দুর্গম কাননে।
অনুকূল হৌক কিম্বা প্রতিকূল পতি,
নগরে বা বনে গিয়া করুক বসতি;

যাহার একান্ত প্রেম পতিতেই রয়,
সনাতন ব্রহ্মলোক সে লভে নিশ্চয়।
দুঃশীল, যথেচ্ছাচারী, নিতান্ত দুর্ম্মতি,
অথবা দরিদ্র অতি হয় যদি পতি,
তথাপি, সে সরবস্ব সতী অবলার,
পতিই আরাধ্যতম দেবতা তাহার।
ইহকালে পরকালে সর্ব্বত্র সদাই,
অবলার বন্ধুজন পতি বিনা নাই।
নারীর অক্ষয় তপ স্বামীই কেবল,
ভবে তার একমাত্র স্বামীই সম্বল;
এ কথা বুঝেনা হায়! দুষ্ট নারীগণ,
কামাধীন হ'য়ে করে যথেচ্ছাচরণ;
পতিরে তাহারা হেরে দাসের সমান,
অধর্ম্মে অযশে করে নরকে প্রয়াণ।
কিন্তু সীতে! সতী যারা তব সম হয়,
ভাল মন্দ বুঝি' তারা ধর্ম্মপথে রয়;
তারা সবে যোগসিদ্ধ ঋষির মতন,
নিত্যানন্দ দিব্যলোকে করে বিচরণ।
মা লক্ষ্মি! তোমারে আমি কি বলিব আর,
পতি-পদে সদা মতি থাকুক তোমার;
পতি-সনে প্রাণপণে ধর্ম্ম-আচরণ,
পতিব্রতা-সদাচার-নিয়ম-পালন—

করিয়া, একান্তভাবে পতি-সাধনায়,
অনশ্বর পুণ্য-যশ লভ এ ধরায়।
অনসূয়া-বাক্য শুনি' সীতা ধীরে ধীরে—
নত-মুখে মৃদু-স্বরে কহে তাপসীরে,—
হেন উপদেশ মাতা! দিবেন আপনি,
ইহাতে আশ্চর্য্য আমি কিছুই না গণি।
নারীর পরম গুরু পতি এ জগতে,
হে দেবি! এ কথা আমি জানি ভাল মতে।
হ'তেন যদ্যপি মোর পতি দুরাচার,
তবু তাঁয় স্থির প্রেম থাকিত আমার।
দোষশূন্য পতি মম সর্ব্বগুণাধার,
কত ভক্তি করি তাঁরে কি বলিব আর?
পতি মোর জিতেন্দ্রিয়, করুণানিধান,
সকলের প্রিয় মাতা-পিতার সমান।
অটল তাঁহার প্রেম, ধর্ম্মময় প্রাণ,
সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, মহাবীর্য্যবান্।
আপন জননী প্রতি যেই ব্যবহার,
অন্যান্য রাণীর প্রতি সেই ভাব তাঁর (১)।

---

(১) দশরথের বহু পত্নী ছিল। রাম সকলকেই জননীনির্ব্বিশেষে যত্ন, ভক্তি ও সেবা করিতেন। কোনও কর্ত্তব্যপালনেও রামের অণুমাত্র ত্রুটী কেহই কখনও দেখেন নাই। একাধারে সর্ব্বগুণের পূর্ণ আদর্শ—রামচন্দ্র।

এ ঘোর বিপিনে যবে করি আগমন,
শ্বশ্রূ মোর বলেছেন যে হিত বচন ;
বিবাহ-সময়ে সেই অগ্নির সকাশে,
বদ্ধ হইয়াছি আমি যে প্রতিজ্ঞা-পাশে ; (১)

(১) "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মম্"—"ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম্"—তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া অবিচ্ছেদে ধর্ম্মাচরণ করিবে, ধর্ম্মে-অর্থে-কামে উভয়ে পরস্পরের প্রতি কায়মনোবাক্যে অব্যভিচারী থাকিবে,—পুরোহিতের এই আদেশে বর-বধূ উভয়কে আবদ্ধ হইতে হয়। অনন্তর, ঈশ্বর, অগ্নি, ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী, সপ্তর্ষি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিকে সাক্ষী করিয়া, হোমাগ্নি-সমীপে বরের নিম্নলিখিত বাক্যসকল পালন করিবার জন্য বধূকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে হয়,—যথা ;—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু, মম বাচমেকমনা জুষস্ব, প্রজাপতিষ্ট্বাং নিযুনক্তু মহ্যম্"—আমার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বকর্ত্তব্যে তোমার হৃদয়কে সঁপিয়া দিলাম ; তোমার চিত্ত সর্ব্বতোভাবে আমার চিত্তের অনুগামী হউক ; তুমি একাগ্রমনে আমার বাক্য পালন করিও ; বিধাতা তোমাকে আমার হিতে নিযুক্ত করুন।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্"—আমার অস্থিতে তোমার অস্থি, আমার মাংসে তোমার মাংস, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিত করিলাম।

"ওঁ ধ্রুবমসি, ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি, ধ্রুবৈধি" ; ইত্যাদি।—আমি তোমাকে ধ্রুব-তারা দেখাইতেছি ; তুমি ধ্রুব-তারার ন্যায় আমাতে

পতি-গৃহে আসি যবে, জননী আমার—
দিয়াছেন উপদেশ যাহা বার বার ;
সে সব অমূল্য কথা—সতীধর্ম্মসার,
মরমে মরমে গাঁথা রয়েছে আমার।
পতি-সেবা বিনা স্ত্রীর ব্রত নাই অন্য,
সাবিত্রী এ ব্রত-বলে সুরলোকে ধন্য।
আপনি যে করেছেন এ দেবত্ব লাভ,
ইহা শুধু পতিব্রতা-পুণ্যের প্রভাব।
নহে মাতা—পিতা—পুত্র, নহে সখীজন,
আপন আত্মাও নহে নারীর শরণ,
এ জগতে একমাত্র আপনার পতি,
ইহকালে পরকালে অবলার গতি।
দেব-রথে কিংবা উচ্চ প্রাসাদে বসতি,
কিংবা অষ্টসিদ্ধি-লাভে শূন্যপথে গতি ; (১)

অনন্তকাল অচলা হইয়া থাক।—ইত্যাদি বহুতর প্রতিজ্ঞাবাক্যের কয়েকটীমাত্র উদ্ধৃত হইল।

(১) অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যথা,—(১) অণিমা ; (২) লঘিমা ; (৩) প্রাপ্তি ; (৪) প্রাকাম্য ; (৫) মহিমা ; (৬) ঈশিত্ব ; (৭) বশিত্ব ; (৮) কামাবসায়িতা। 'অণিমা' শক্তি দ্বারা অলক্ষ্য সূক্ষ্ম শরীরে আকাশাদি সর্ব্বত্র বিচরণ করা যায়। 'লঘিমা'-শক্তি দ্বারা এরূপ লঘুতা জন্মে, যে, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করা যায়। "প্রাপ্তি" দ্বারা সমস্ত দুর্লভ বস্তু লাভ হয় ; কথিত আছে, এই শক্তি থাকিলে অঙ্গুলির

এ সব হইতে শ্রেষ্ঠ পতির চরণ,
পাপিষ্ঠ হ'লেও পতি সতীর শরণ।
বনে বনে পতি-সনে করিয়া ভ্রমণ,
ক্ষুধা বা পিপাসা আমি জানি না কেমন;
শরীরে সন্তাপ, শ্রম, ভয়-চিন্তা মনে,
কিছুই জানি না আমি প্রিয়তম সনে।
উড়িয়া পবন-বেগে ধূলা-মলা-রাশি—
শরীরে আমার যবে লগ্ন হয় আসি,
মনে হয় যেন—বায়ু অমূল্য চন্দন--
মম গাত্রে স্নেহ করি' করিছে লেপন।
দুর্গম অরণ্য-পথে করিতে ভ্রমণ,
কুশ-কণ্টকাদি গাত্রে লাগে অগণন,
পতি-সনে সে সকল মম সুখকর,—
যেন অতি সুকোমল কুসুম-নিকর।

অগ্রভাগে চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায়। 'প্রাকাম্য'* দ্বারা সকল কামনা পূর্ণ হয়; ভূমির ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উত্থিত ও নিমগ্ন হওয়া যায়। 'মহিমা' দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে অপরিমেয়, অসীম বিস্তৃতি লাভ করা যায়। 'ঈশিত্ব' দ্বারা পঞ্চভূতের ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থের উপর প্রভুত্ব জন্মে। 'বশিত্ব' দ্বারা সর্ব্বভূত বশীভূত হয়। 'কামাবসায়িতা' দ্বারা অবিদ্যাজনিত বাসনার ক্ষয় হয় এবং সঙ্কল্পানুরূপ বস্তু উৎপন্ন করা যায়। এই আটটী বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য দেবতারা ও সিদ্ধ যোগীরা লাভ করিয়া থাকেন।

নিদাঘ-সময়ে যবে প্রখর ভাস্কর
অগ্নিময় করজালে দহে চরাচর,
সে চণ্ড আতপ, পথে প্রিয়তম-সঙ্গে,
সুধাকর-কর-সম লাগে মোর অঙ্গে।
ফল-মূল আদি পতি করিলে আহার,
থাকে যাহা অবশিষ্ট প্রসাদ তাঁহার,
অমৃত-সমান তাই করিয়া আহার,
অতুল আনন্দ তৃপ্তি জনমে আমার।
রাত্রিকালে তরুতলে গহন কাননে,
শয়ন করিয়া মম প্রিয়তম-সনে,
শুষ্ক তৃণ-পর্ণ-শয্যা করি আমি জ্ঞান—
নবনীত-সুকোমল শয্যার সমান।
বনবাসে যে যে কষ্ট সর্ব্ব লোকে কয়,
পতি-প্রেমে সে সকলি মম সুখময়;
সহস্র সহস্র বর্ষ, যুগ-যুগান্তর—
পতি-সনে থাকি যদি অরণ্য-ভিতর,
যে আনন্দ লভি তায় বলিব কেমনে,
কোটি কোটি স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ হয় মনে।
পবিত্র তাপসীভাবে থাকি অনুক্ষণ,
দিবা-নিশি করি সেবা স্বামীর চরণ;
পতিব্রতা-ব্রতমাত্র সদা মোর ধ্যান,
ত্রিসংসারে অন্য কিছু নাহি মোর জ্ঞান।

পতিকে হেরিলে সুখী, থাকি আমি সুখে,
পতিকে হেরিলে দুঃখী মরি আমি দুঃখে;
পতিপ্রেমে প্রেমময় নিরমল চিত—
পতি-পদে সর্ব্বভাবে করি' সমাহিত—
পরম আনন্দে থাকি বিজন কাননে,
মাতা-পিতা-গৃহ-বন্ধু নাহি ভাবি মনে।
দেবি! মোর গতি-মুক্তি পতিই সকল,
আরাধ্য দেবতা মোর পতিই কেবল;
সদা পতি-সঙ্গ পরকালেও আমার—
সর্ব্ব কল্যাণের সর্ব্ব সৌভাগ্যের সার।

বিপন্নরক্ষায় প্রাণদান।

জটায়ু।

দণ্ডকারণ্যে খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসসেনাপতি ও তদনুচর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসেনার নিধনে এবং সহোদরা শূর্পণখার নিগ্রহে রামের উপর রাবণের বিদ্বেষ ও বৈরানল প্রজ্বলিত হইল। বিশেষতঃ শূর্পণখার মুখে রামপত্নী সীতা-দেবীর অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, রাবণ কামান্ধ হইয়া, কৌশলে সীতাকে হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাবণের আদেশে নিশাচর মারীচ মায়াবলে বিচিত্র মণিরত্নাদি-খচিত অদ্ভুত স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ করিয়া, রামের পর্ণশালার

সম্মুখে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। জানকী সেই অদৃষ্টচর, অত্যাশ্চর্য্য মৃগ দর্শন করিয়া, পতিকে কহিলেন,—নাথ! ওরূপ অপরূপ মৃগ ত কখনও দেখি নাই! ঐ মৃগ আমাকে ধরিয়া দিন। উহাকে যদি জীবিতাবস্থায় আনিতে পারেন, আমি উহাকে পুষিব। অন্যথা উহাকে বধ করিয়া, উহার চর্ম্ম আনিয়া দিন। আমরা গৃহে গিয়া, ঐ আশ্চর্য্য বস্তু সকলকে দেখাইব। উহা দেখিলে, আমার শ্বশ্রূ, দেবর ও সখীগণ সকলে বিস্মিত হইবে, ও কত আনন্দ প্রকাশ করিবে।

রাম প্রিয়তমার মনোরথ পূর্ণ করিতে উৎসুক হইলে, লক্ষ্মণ বিনয়বচনে কহিলেন, আর্য্য! আমার মনে ঘোর আশঙ্কার উদয় হইতেছে। এ প্রদেশে বহুতর মায়াবী রাক্ষস বিচরণ করে; তাহারা নানা ছলে লোকের প্রাণসংহার করে। বিশেষতঃ এ স্থানে সেই বিখ্যাত মায়াবী মারীচের বাসস্থান। সে দুরাত্মা পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া (১), অথবা রাবণের আদেশে, আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বিচিত্র মায়াবলে সেই দুর্বৃত্ত যে, কতশত রাজা, মুনি-ঋষি, ও অন্যান্য সাধু ও পথিকগণের প্রাণসংহার

(১) রাক্ষসগণের উপদ্রব হইতে নিজ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য, মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাম তখন দশবর্ষের শিশু। তিনি যজ্ঞবিঘাতক সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। তাহাদের দলপতি, মায়াবী মারীচ রামবাণে আহত হইয়া শত যোজন দূরে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তদবধি রামের প্রতি তাহার নিদারুণ বৈরভাব

করিয়াছে, তাহার সংখ্যা, নাই। অতএব উহাতে লোভ করিবেন না। ওরূপ স্বর্ণময়, রত্নখচিত মৃগ কদাচ অকৃত্রিম হইতে পারে না।

কিন্তু সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিষেধবাক্য মানিলেন না। তিনি ঐ মৃগের জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে, রামকে অগত্যা তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া গমনকালে লক্ষ্মণকে বারংবার বলিয়া গেলেন,—ভ্রাতঃ! সাবধানে জানকীকে রক্ষা করিও। কোনও কারণে, প্রাণান্তেও উহাঁকে ফেলিয়া কোথাও যাইও না। প্রিয়া আমার নিকট কখনও কোনও বস্তু প্রার্থনা করেন নাই, এ প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে মনস্তাপ পাইবেন। ইহা বলিয়া, রাম দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। সেই মৃগ বিচিত্র লীলা প্রকাশ করত, ক্ষণে দূরে, ক্ষণে সমীপে দৃশ্যমান, এবং ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইতে লাগিল। রামও তাহার মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া, তৎকর্ত্তৃক সুদূরে নীত হইলেন।

রামের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণ চিন্তিত হইলেন। সীতার মনে নানা ভয় ও দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বিশেষতঃ লক্ষ্মণ ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—এ স্থান বড় ভয়ানক, নানা মায়া ধরিয়া দুরাত্মা রাক্ষসেরা এ স্থানে বিচরণ করে, সাধুগণের হত্যাই রাক্ষসদিগের ব্যবসায়। ওরূপ হরিণমূর্ত্তিও অসম্ভব। হায়! হায়! আমি না বুঝিয়া কি করিলাম! না জানি আর্য্যপুত্রের কি বিপদ্ ঘটিল!

সীতা এইরূপ দুশ্চিন্তায় নিমগ্না, ইত্যবসরে দূর হইতে— "হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!" এইরূপ আর্ত্তনাদ উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। পতির অবিকল কণ্ঠস্বরসদৃশ সেই আর্ত্তনাদ সীতার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইল। সীতা বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় কাতর স্বরে কহিলেন,— বৎস লক্ষ্মণ! বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইল! এ যে আমার আর্য্যপুত্রেরই কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় তিনি ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া তোমাকে ডাকিয়াছেন। আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর বিবশ ও মন আকুল হইতেছে, যাতনায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, আমি আর চক্ষে দেখিতে পাই না। যাও বৎস! তোমার বিপন্ন, শরণার্থী ভ্রাতাকে রক্ষা কর। নিশ্চয় তিনি রাক্ষসের কবলে পতিত হইয়া হত হইতেছেন। হায়—হায়! এতক্ষণে হয়ত তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইল। যাও—যাও! শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও!—

সুধীর ও সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ রামের কোনও বিপদের আশঙ্কা করিলেন না। তিনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কহিলেন,— আর্য্যে! ভয় নাই, এ নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া। ত্রিলোকবিজয়ী আর্য্যের নিকট একটা সামান্য রাক্ষসের প্রাণবধ অতি তুচ্ছ কথা। নিশ্চয় সেই দুর্ব্বৃত্ত মারীচ আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য, এ চাতুরী করিয়াছে। আপনি কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করুন, রাক্ষস বধ করিয়া আর্য্য এখনি আসিবেন। এ সঙ্কটাকীর্ণ স্থানে আপনাকে একাকিনী রাখিয়া আমি কোথাও যাইব না;

বিশেষতঃ আর্য্য আমাকে আপনার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

রামময়জীবিতা, পতির বিপদাশঙ্কায় উন্মাদিনী সীতার নিকট লক্ষ্মণের সেই সরল ও যুক্তিযুক্ত কথা সে সময় বিষতুল্য জ্ঞান হইল। তিনি কোপে অধীরা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,— লক্ষ্মণ! তুমি তোমার ভ্রাতার মিত্ররূপী ঘোর শত্রু, তাই তুমি এ বিপদেও তাঁহার সাহায্য করিতেছ না। তুমি আমার উপর লোভবশতই তোমার ভ্রাতার বিনাশ কামনা করিতেছ। হা ধিক্! তুমি কি ভাবিয়াছ, যে তাঁহার নিধনেও আমি নিমেষমাত্র বাঁচিব? ইহা বলিয়া জানকী শিরে ও বক্ষে করাঘাত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং ভূতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

যে জ্যেষ্ঠভক্ত দেবরের অপাপস্পৃষ্ট, অনির্ব্বচনীয় পুণ্য-চরিত্র সীতা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে সুদীর্ঘকাল অনুভূত, যে ধর্ম্মবীর তাঁহাদের সেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী, আহার-নিদ্রাও পরিহার করিয়াছেন, যিনি গৃহে, অরণ্যে, উৎসবে, ব্যসনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের অনুগামী, যিনি তাঁহার প্রাণের দেবতা রাম-সীতার জন্য জননী ও জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন, অহহ! সেই ভ্রাতৃপ্রাণ, নিষ্পাপ লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই উক্তি! সীতার সেই কথাকয়টী বিষদিগ্ধ নারাচের ন্যায় লক্ষ্মণের মর্ম্মভেদ করিল! তিনি মর্ম্মপীড়ায় শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্যবলে সে ভাব সংবরণ

করিয়া, যুক্তকরে জগদীশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—হে সর্ব্বান্তঃসাক্ষিন্! সর্ব্বব্যাপিন্! জগদীশ! তুমি আমার মনোভাব জানিতেছ, আমি রামপত্নী আর্য্যা সীতাদেবীকে অতি সঙ্কটের অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি, দেখিও দয়াময়! যেন ইহাঁর কোনও অনিষ্টঘটনা না হয়। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমার প্রতি যে লোম-হর্ষণ, বীভৎস বাক্য প্রয়োগ করিলেন, আমি তাহার উত্তরদানে অক্ষম। কেননা, আপনি আমার মাতৃতুল্য গুরুজন, বিশেষতঃ অবলা। হে বৈদেহি! জ্বলন্তশল্যসম, আপনার বীভৎস কটূক্তি আমার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানকে দগ্ধ করিতেছে। হা ধিক্! এরূপ কথা আমি সহ্য করিতে অক্ষম। আমি আপনার পুত্রস্থানীয়। যখন এ সন্তানের উপর আপনার এতদূর আশঙ্কা, তখন নিশ্চয় ঘোর বিপদ্ উপস্থিত! চতুর্দ্দিকে দুর্লক্ষণও দেখিতেছি। আমি চলিলাম, আর্য্যে! আপনার মঙ্গল হউক। হে বনদেবতাগণ! এই অসহায়া রামপত্নীকে রক্ষা কর! হে লোকপালগণ! এই বিপন্না সতীকে রক্ষা কর! আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া, আর্য্য ও আর্য্যাপত্নীকে একসঙ্গে কুশলে অবস্থান করিতে দেখি।

সীতা বাষ্পাকুল লোচনে লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার কহিলেন,—তুমি যদি এই মুহূর্ত্তেই না যাও, তবে আমি গোদাবরীতে ডুবিয়া মরিব, অথবা উদ্‌বন্ধনে, বা তীব্র বিষভক্ষণে, কিম্বা হুতাশনে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। ইহা বলিতে বলিতে

সীতা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ সীতার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং বারংবার পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া সীতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধন্য লক্ষ্মণ! তুমি এ বিপ্লবেও আপন দেবদুর্লভ প্রকৃতির সাম্য রক্ষা করিলে! ধন্য মাতা সুমিত্রা! তিনি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবটীবনে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই প্রস্থান করিলে, দুর্বৃত্ত দশানন অবসর বুঝিয়া, অপূর্ব্ব পরিব্রাজকের বেশে সীতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধেয় সুন্দর রক্তবস্ত্র, মস্তকে দীর্ঘশিখা, বামস্কন্ধে দণ্ড ও কমণ্ডলু স্থাপিত, মুখে ঘন ঘন বেদধ্বনি। সে তাদৃশ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিলেও, তাহার স্বভাবের ভীষণতা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহাকে দর্শন করিয়া বনজন্তুগণ ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। বনভূমিও যেন আতঙ্কে নিস্তব্ধা, পবনদেবও ভয়ে মন্দগতি, তরু-লতা স্পন্দহীন।

দুরাত্মা রাবণ, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় এইরূপ সাধুবেশে আসিয়া দেখিল,—পূর্ণচন্দ্রনিভাননা জানকী পতির অমঙ্গল-ভাবনায় ম্রিয়মাণা হইয়া একাকিনী বসিয়া আছেন, শোকভরে উভয় গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। তিনি করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, অধর ও নাসাগ্র ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। সীতাকে তাদৃশ শোচনীয় অবস্থায়

দর্শন করিয়াও দুরাত্মার মনে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। প্রত্যুত সে কামশরে বিদ্ধ হইয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে কুটীরদ্বারে আসিয়া, বাহু তুলিয়া, স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিল। সীতা দ্বারে তাদৃশ মহাপ্রভাব অতিথিকে উপস্থিত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে উঠিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক, করযোড়ে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদি দান করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর বিনয়মধুর বাক্যে কহিলেন,—ভগবন্! কৃপা করিয়া যদি এস্থানে পদার্পণ করিলেন, তবে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, আমার পতি ও দেবর এখনি আগমন করিবেন, এবং ভবাদৃশ অতিথিলাভে পরমানন্দ অনুভব করিবেন। ফল, মূল, সিদ্ধান্ন প্রস্তুত আছে, কৃপা করিয়া ভোজন করুন এবং স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। রাবণ কহিল,—অয়ি তপ্তকাঞ্চনবর্ণে! পীতকৌষেয়বাসিনি! সুন্দরি! আহা! এমন রূপ ত কোথাও দেখি নাই; মর্ত্ত্যলোকের কথা দূরে থাক, দেবলোকেও ঈদৃশ রূপলাবণ্য দৃষ্ট হয় না। ভদ্রে! কি কারণে এ শিরীষ-সুকুমার দেহকে কঠোর বনবাসক্লেশে পাতিত করিয়াছ? যদি কোনও বাধা না থাকে, তবে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর। অভ্যাগতের ঐ বাক্যে সরলা সতীর নিষ্পাপ হৃদয়ে কোনও সন্দেহের উদয় হইল না। তিনি আরো ভাবিলেন,—ইনি অতিথি ও ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বেশভূষা দেখিয়া ইহাঁকে মহাপ্রভাব যোগী বলিয়া বোধ হইতেছে।

যদি ইহাঁর বাক্যে উপেক্ষা করি, তবে ইনি রুষ্ট হইয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাতে আমার পতির অমঙ্গল ঘটিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া, সীতা পতিদেবের নির্ব্বাসনঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। রাবণ সে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, যেন তদীয় দুঃখে তাহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল, এইরূপ ভান করিয়া কহিল, অয়ি বিলাসিনি! ঈদৃশ সুকুমার রূপরাশির এরূপ ভীষণ স্থানে, দীনহীনভাবে অবস্থান করা নিতান্ত বিসদৃশ। বলিতে কি, তোমার এ দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এ অতি ভয়াবহ স্থান। ঘোর কামরূপী রাক্ষসগণ নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া এ স্থানে বিচরণ করে। এ স্থানে তোমার ক্ষণমাত্র অবস্থান করা উচিত নয়। আমার সঙ্গে চল। মণিরত্নোদ্ভাসিত, অভ্রভেদী, অপূর্ব্ব প্রাসাদে বাস করিবে। যথায় যুগপৎ সকল ঋতুর ভোগ্যপদার্থ সদাই বিদ্যমান, যাহার তুলনায় নন্দন ও চিত্ররথ-কাননও নগণ্য, তাদৃশ নগরোপবনে পরমানন্দে বিহার করিবে; ত্রিদিবদুর্লভ রূপ-রসগন্ধাদি ভোগ্য-বস্তু সেবন করিবে; লক্ষ লক্ষ দাস-দাসী নিরন্তর তোমার সেবায় প্রাণপণে নিযুক্ত থাকিবে। তুমি যখন যাহা কামনা করিবে, তাহা ব্রহ্মার অলভ্য হইলেও, তৎক্ষণাৎ তোমার সমীপে আনীত হইবে। তুমি ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের কথা শুনিয়াছ? আমিই সেই লঙ্কেশ্বর রাবণ। সমুদ্রপরিবেষ্টিতা অলঙ্ঘ্যা পুরী লঙ্কা আমার রাজধানী। ত্রিকূটগিরিশৃঙ্গোপরি আমার স্বর্ণপুরী লঙ্কা, হেমরত্নখচিতা সৌধমালায় সমলঙ্কৃতা হইয়া,

নক্ষত্রমালিনী শশাঙ্কমণ্ডলীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ কিঙ্করের ন্যায় নিয়ত আমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত। পিতা-মাতার পরিত্যক্ত, বল্কলধারী, বনবাসী, ভিখারী রাম কি তোমার যোগ্য পতি? হা ধিক্! তুমি সে দীনহীন, অকিঞ্চন ও অকর্ম্মণ্য পতিকে ত্যাগ করিয়া, আমাকে ভজনা কর, ত্রিলোকী-নাথ লঙ্কেশ্বরের পট্টমহিষী হও। অহো! তোমার কি সৌভাগ্য! শচীদেবীরও প্রার্থনীয় স্বয়ং দশানন তোমার প্রণয়প্রার্থী।

দুর্বৃত্তের ঐরূপ বীভৎস বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে সীতার মুখ রক্তবর্ণ হইল। তাঁহার নয়ন দিয়া যেন অনলকণা বাহির হইতে লাগিল। অধর কম্পিত ও ললাটে ভ্রূকুটি বদ্ধ হইল। বীরপত্নী মৈথিলী বজ্রনাদে কহিলেন,—রে দুরাত্মন্! পাপিষ্ঠ! পিশাচ! তুই কুক্কুর হইয়া বিষ্ণুভোগ্য যজ্ঞিয় হবি কামনা করিতেছিস্! হা পামর! সিন্ধুগামিনী মহানদী কি কূপে মিলিত হয়? নিশ্চয় তোর আসন্নকাল উপস্থিত। আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেই তুই সবংশে নিহত হইবি, তোর বংশে এক প্রাণীও জীবিত থাকিবে না। আমার পতির রোষানলে ও আমার অভিশাপে তোর সে স্বর্ণপুরী লঙ্কা ভস্মসাৎ হইবে। তুই ত্রিলোকবিজয়ী বীর বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, অসহায়া, নিরপরাধা সতীর সর্ব্বনাশ করা কি বিশ্ববিজয়ী বীরের ধর্ম্ম? দুরাত্মন্! আমি তোর হিতের জন্য বলিতেছি, আমার পতি বা দেবর না আসিতে আসিতে তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন কর্! অরে পাপিষ্ঠ! যদি কেহ বজ্রধারী ইন্দ্রের

ভার্য্যা শচীকে হরণ করিয়াও জীবিত থাকে, তথাপি তুই রাম-পত্নীকে হরণ করিয়া, অমৃতসিন্ধুপান করিলেও জীবিত রহিবিনা।

সীতার সেই তিরস্কারবাক্যে রাবণের রোষানল প্রজ্বলিত হইল। সে করে করাঘাত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক কটকটা-শব্দ উত্থিত করিয়া, রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন অলাত-চক্রের ন্যায় তাহার চক্ষু জ্বলন্ত ও বিঘূর্ণিত। তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে প্রকাণ্ড দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও স্তম্ভাকার বিংশতি বাহু আবির্ভূত হইল। রোষে তদীয় নেত্রসকল হইতে জ্বলন্ত বর্ত্তিকাখণ্ডের ন্যায় অশ্রু স্খলিত হইতে লাগিল। সীতার সম্মুখে আর সে সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী নাই। তৎপরিবর্ত্তে রাবণরূপী, কালান্তক কাল দণ্ডায়মান। হায়! মোহান্ধ লোক, আপাতসুখের প্রলোভনে আত্মহারা হইয়া, এরূপ মহাপাপে প্রবৃত্ত হয় যে, পরক্ষণেই যে সেই কার্য্যের প্রতিফলস্বরূপ তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে, এ কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। রাবণ কঠোর বাক্যে মৈথিলীকে তিরস্কার করিয়া কহিল,—রে মূঢ়ে! নিশ্চয় তোর উন্মাদ ঘটিয়াছে। তুই শমনবিজয়ী রাবণের বিক্রমের কথা শুনিস্ নাই? আমি এই বাহুদ্বারা সসাগরা, সদ্বীপা মেদিনীকে ঊর্দ্ধে তুলিতে পারি। সমরে কৃতান্তকেও সংহার করিতে পারি। চন্দ্র-সূর্য্যকেও উৎপাটন করিতে পারি। প্রচণ্ড শরনিকরে চতুর্দ্দশ ভুবনকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।

সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ, প্রকাণ্ড, বিকটমূর্ত্তি রাক্ষস-দর্শনে ভীতা হইয়া বনদেবতারাও দূরে পলায়ন করিলেন। তেজোনিধি

সূর্য্যদেবও যেন ভীত হইয়া মেঘান্তরালে অদৃশ্য হইলেন। অকস্মাৎ তথায় অদ্ভুতদর্শন রাবণরথ আসিয়া উপস্থিত! ঐ রথ পিশাচবদন খরগণদ্বারা বাহিত। উহা ভাস্বর সুবর্ণে নির্ম্মিত ও বৈদূর্য্যাদি বিচিত্র মণিমাণিক্যে উৎখচিত, এবং উহা রাবণের ইচ্ছানুসারে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতগতি। সেই ঘোরদর্শন কৌণপপতি, ভয়বিহ্বলা, বেপমানা, বিচেতনপ্রায়া সীতাকে বলপূর্ব্বক নিজ রথে তুলিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। জানকী বাণবিদ্ধহৃদয়া বিহঙ্গীর ন্যায় রাবণক্রোড়ে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ও কণ্ঠনালী ভেদ করিয়া "হা রাম! হা রাম!" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই গগনভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত বনভূমি কম্পিত ও গিরিকন্দর-সকল প্রতিধ্বনিত হইল।

যথায় এই ঘটনা ঘটিল, তাহার অনতিদূরে মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ুর বাসস্থান। মন্বন্তরপুরাণ, পক্ষিরাজ জটায়ু তখন জরাজীর্ণ ও ভগ্নদেহ। অকস্মাৎ অবলাকণ্ঠোত্থিত, পাষাণ-ভেদী রোদনধ্বনি জটায়ুর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি চমকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—দুরাত্মা রাবণ রামপত্নীকে হরণ করিতেছে, অশরণা সতী হাহাকার করিতেছেন। সতীর প্রতি এ লোমহর্ষণ অত্যাচার জটায়ুর প্রাণে সহিল না। তখন যেন তাঁহার জরা ও গ্লানি তিরোহিত এবং তেজোময় নবযৌবন আবির্ভূত হইল। তিনি মহাকোপে রাবণের রথের দিকে ধাবমান হইলেন।

জটায়ু আসিয়া রাবণের রথমার্গ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রথমতঃ ভদ্রভাবে রাবণকে বুঝাইয়া বলিলেন,—রাবণ! তুমি জগদ্গুরু পুলস্ত্যমুনির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ত্রিলোকীনাথ, ভগবান্ মহাদেব তোমার গুরু। তোমার প্রজ্ঞাও অসীম; তোমার তপস্যারও তুলনা নাই। তুমি সহস্র সহস্র বর্ষ সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছ, বারংবার স্বহস্তে নিজ দশ মুণ্ড ছিন্ন করিয়া, সেই রক্তাক্ত মুণ্ডসকল হোমানলে আহুতি দিয়াছ। তোমার ঐশ্বর্য্যের ও প্রতাপের ইয়ত্তা নাই। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তোমার কৃপাভিখারী। হায়! তুমি এত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, কর্ম্মদোষে শেষে নিজের ও বংশের সর্ব্বনাশ ঘটাইলে! এ যে সাক্ষাৎ কালসর্পকে তুমি আলিঙ্গন করিতে উদ্যত!

যখন দুরাত্মা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন জটায়ু সক্রোধে কহিলেন,—অরে রাক্ষসাধম! পাপিষ্ঠ! পিশাচ! কি সাধ্য তুই আমার সাক্ষাতে রামপত্নীকে হরণ করিবি? যদি তোর আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান থাকে, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্! আমি জীবিত থাকিতে তুই মা জানকীকে হরণ করিতে পারিবি না। আমি বৎস রামের প্রিয়কার্য্য করিবই। বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায় তোর দিব্যরথ হইতে তোকে ভূতলে পাতিত করিব। তোর যতদূর শক্তি, আমার সহিত যুদ্ধ কর্।

জটায়ুর ঐ কথা শুনিয়া রোষে রাবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তাহার নয়নদ্বার দিয়া অনলরাশি বাহির হইতে লাগিল।

সে ক্রোধভরে রথ ফিরাইয়া, হুহুঙ্কারনাদে জটায়ুকে আক্রমণ করিল। অনন্তর উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। জ্ঞান হইল, যেন প্রলয়পবনে উৎক্ষিপ্ত দুই মহাগিরির ভীষণ সঙ্ঘর্ষ!

রাবণ, সুতীক্ষ্ণ নালীক, নারাচ, শেল, শূল, প্রভৃতি সাংঘাতিক অস্ত্রজালে জটায়ুকে বিধূনিত করিতে লাগিল। রাবণাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হইয়াও, তিনি সুতীব্র নখাঘাতে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত করিলেন। জটায়ুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইল, এবং কালদণ্ডস্বরূপ রাশি রাশি দিব্যাস্ত্র জটায়ুর উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। জটায়ু নিদারুণ প্রহারে বিহ্বল ও বিচেতনপ্রায় হইয়াও, যখন দেখিলেন,—জানকী সেই দুরাত্মার ক্রোড়ে নিরুদ্ধা ও বারংবার বিলুণ্ঠিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কাতরভাবে বারংবার তাঁহারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তখন তিনি নিজের সে নিদারুণ শস্ত্রপ্রহার-বেদনা বিস্মৃত হইলেন, এবং পুনরায় মহাতেজে সেই দুরাত্মাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি রাবণের শরপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর ও বজ্রতুল্য সুদৃঢ় শরাসন দুই পদে ধারণপূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন। অনন্তর রাবণের রত্নময় দিব্যমুকুট ও সৌবর্ণ বর্ম্মকে চূর্ণ করিলেন। তাহার সে দিব্য রথ ও ভীমমূর্ত্তি বাহনসকল জটায়ুর পদাঘাতে বিচূর্ণিত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। তদীয় অমূল্য ছত্র, ও চামর-দণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ্নসকলও ধূলিসাৎ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, রাবণ শেষে ভগ্নরথ, হতবাহন, হতসারথি ও ধনুর্ব্বাণশূন্য হইয়া সীতাকে লইয়া, লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িল,

এবং সীতাকে ছাড়িয়া কৃপাণ ধারণপূর্ব্বক, তর্জ্জন করিতে করিতে জটায়ুর দিকে ধাবমান হইল।

যখন ভূতলে উভয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল, তখন সীতা বিপর্য্যস্ত বেশে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, উন্মত্তার ন্যায়, কখনও লতান্তরালে লুকাইয়া, কখনও তরুকাণ্ড দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, কখনও ইতস্ততঃ ধাবমানা হইয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহার পদস্খলন ও কণ্টকাকীর্ণ ভূতলে পতনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। তিনি বাণাহতা হরিণীর ন্যায় রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অহো! জীবগণের ভবিতব্যতাকে কে খণ্ডন করিতে পারে? শেষে রোষোন্মত্ত, পাপিষ্ঠ, পিশাচ দশগ্রীব ভীষণ খড়গাঘাতে সেই বিপন্নত্রাতা, দয়াবীর, বৃদ্ধ পক্ষিরাজকে ধরাশায়ী করিল। দুরাত্মার শস্ত্রে ছিন্নপক্ষ, ছিন্নচরণ ও রুধিরাক্ত-কলেবর জটায়ু ভূতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সীতা সংজ্ঞালাভ করিয়া, জটায়ুকে তদবস্থ দেখিবামাত্র উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বশরীর প্লাবিত হইল। তিনি হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পিতঃ! হা শকুন্তরাজ! হা দীনবন্ধো! হা সতীর ধর্ম্মরক্ষক! হা পরদুঃখকাতর! হা দয়াবীর! হা পুণ্যশ্লোক! উঠ! উঠ! তোমার কন্যাকে দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা কর! হায়! হায়! আমার জন্য

তোমার এ দশা হইল! হায়! হায়! কি হতভাগিনী আমি! বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দুরাত্মা রাবণ সুযোগ পাইয়া, সেই অনাথার ন্যায় রোরুদ্যমানা, অশরণা সতীর অভিমুখে ধাবিত হইল। সীতা দৌড়িয়া গিয়া একটী বৃক্ষকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। যমমূর্ত্তি দুর্ব্বৃত্ত রাবণ, "ছাড়্—ছাড়্! শীঘ্র বৃক্ষ ছাড়িয়া দে" বলিতে বলিতে গিয়াই তাঁহার কেশগ্রহণ করিল, এবং সবলে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। রাবণগৃহীতা সতীর তুমুল আর্ত্তনাদে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ স্ফুটিত হইতে লাগিল। রাবণ সেই পতিদেবতা সতীর কেশাকর্ষণ করিবামাত্র, সমস্ত জগৎ যেন শ্রীভ্রষ্ট, বিপর্য্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইল। দিবাকর যেন রসাতলে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন হইল। পবনের গতি নিরুদ্ধ ও প্রাণিগণ নিস্পন্দ হইল। যোগাসনস্থ ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ হইল; তাঁহারা "স্বস্তি-স্বস্তি" বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দ্রুম, লতা, চরাচর সমস্তই গভীর বিষাদে নিমগ্ন, কেবল দেবগণ সানন্দে বলাবলি করিতে লাগিলেন;—আজি জগতের শুভদিন! এতকালের পর, সর্ব্বলোককণ্টক, দুরাত্মা রাবণের সমূল সংহারের পথ উন্মুক্ত হইল।

জটায়ু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—প্রাণ দিয়াও দুর্ব্বৃত্ত দশাননের হস্ত হইতে বিপন্না সতীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা

করিবেন। তিনি সে সত্য পালন করিলেন। এই ঘটনার পর, রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে যখন জটায়ুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অন্তিম শ্বাস বহিতেছিল। যেন তাঁহার প্রাণবায়ু, রামকে সীতার সংবাদ বলিবার জন্যই, দেহে এতক্ষণ অবস্থান করিতেছিল। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে সীতার সংবাদ বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি সীতার জন্য নিজে যাহা করিয়াছেন, তাহার নামগন্ধও করিলেন না। তিনি মুখে সে কথার উল্লেখ না করিলেও, তদীয় ছিন্ন পক্ষ, ছিন্ন পদ ও ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাঁহার সে সুমহৎ কর্ম্ম রামকে জানাইয়া দিল।

মহাত্মন্ পক্ষিরাজ! তুমি যে কার্য্য করিয়া গেলে! জরাজীর্ণ মুমূর্ষু কালেও যে বীর্য্য ও যে মহত্ত্ব দেখাইলে! জগতে যতদিন পুণ্যের গৌরব ও মহত্ত্বের আদর থাকিবে, ততদিন লোকসমাজ তোমার এ আত্মত্যাগের কথা বিস্মৃত হইবে না। কথিত আছে, রাম ও লক্ষ্মণ অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়াছিলেন, এবং পিতৃনির্ব্বিশেষে তদীয় শ্রাদ্ধ-তর্পণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিপন্ন পরিবারের ধর্ম্মানুরাগ

ও

কুন্তীদেবীর মহত্ত্ব

বকরাক্ষস-বধ।

ধর্ম্মাত্মা মহামতি বিদুরের মন্ত্রণাবলে, পাণ্ডবগণ জননী কুন্তীর সহিত নিশাকালে বারণাবতের জতুগৃহদাহ হইতে পলায়নপূর্ব্বক ঘোর অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সকল লোকে জানিল যে, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন। মনোরথ সিদ্ধ হইল ভাবিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইল, এবং পাণ্ডুপুত্রগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্তমনে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা ভয়সঙ্কুল ঘোর অরণ্যে ভীষণ সঙ্কটসকল অতিক্রম করিয়া, একচক্রানগরে আসিয়া এক ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মগোপনপূর্ব্বক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে রহিলেন। তাঁহারা দিবাভাগে ভিক্ষার্থে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন, এবং রাত্রিকালে বেদাধ্যয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এরূপে তথায় তাঁহাদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের দীনদয়া ও পরোপকারাদিগুণে লোকসকল মুগ্ধ হইল। অথচ এরূপ

নিপুণভাবে আত্মগোপন করিলেন যে, কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না।

একদা, চারি ভ্রাতা ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছেন, কেবল কুন্তী ও ভীমসেন সেই ব্রাহ্মণগৃহে আছেন। ইত্যবসরে তথায় অকস্মাৎ হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দয়াবতী কুন্তী সেই করুণ রোদনধ্বনি শ্রবণে ব্যথিতা হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন,—বৎস! দেখ! দেখ! এ পরিবারে আজি কি দুর্ঘটনা উপস্থিত! আমরা ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া ইহাঁদের গৃহে আশ্রয়লাভ করিয়াছি। আমি মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবি,—কিরূপে এই আশ্রয়দাতার কোনও প্রত্যুপকার করি। কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উপকারীর প্রত্যুপকার করাই মনুষ্যত্ব। যদি কেহ এক-গুণ উপকার করে, তবে তাহার শতগুণ প্রত্যুপকার করিতে হয়। আমি পতিহীনা ও রাজ্যভ্রষ্টা, তোমরা এই পাঁচটী পুত্রই আমার পঞ্চ প্রাণবায়ু, এ অনাথার সর্ব্বস্ব ধন, তথাপি পরোপকারার্থ তোমাদিগকেও বিসর্জ্জন করিতে আমি কুণ্ঠিতা নহি। নিশ্চয় আজি এ পরিবারে কোনও দুর্ঘটনা উপস্থিত। যদি ইহার প্রতীকার করিতে পারি, তবেই আমার মনের শান্তি হয়। জননীর কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—মা! তুমি এখনি গিয়া জানিয়া আইস, আজি ইহাঁদের কি বিপদ্ উপস্থিত। আমি তাহা জ্ঞাত হইয়া, প্রাণ দিয়াও ইহাঁদের সাহায্য করিব।

তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন

সময়ে সেই গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের ও তদীয় পত্নীর আর্ত্তনাদ পুনরায় তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তখন কুন্তী বৎসহারা ধেনুর ন্যায় নিতান্ত কাতরা হইয়া, দ্রুতপদে সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, তাঁহাদের একটী শিশুপুত্র ও কন্যা, চারিজনে বিষণ্ণবদনে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন,—অহো! আমাদের এই অনর্থক, দুঃখময় জীবনধারণে ধিক্! এ পরাধীন জীবন কেবল শোক ও সন্তাপভোগের জন্য। এমন কোনও উপায় দেখি না যে, এ নিদারুণ বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। ব্রাহ্মণি! এ ভীষণ স্থান হইতে পলায়নের কথা তোমাকে কতবার বলিয়াছি এবং সে জন্য কত চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমার কথা শুন নাই। আমি যখনি এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছি, তখনি তুমি নির্বন্ধসহকারে বলিয়াছ,—"দেখ নাথ! এ স্থানে আমাদের পিতা-মাতা ও জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা পুরুষানুক্রমে যাবজ্জীবন বাস করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। এ স্থানের প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রাণের এক অনির্ব্বচনীয়, আনন্দময় নিগূঢ় সম্বন্ধ! অতএব এ প্রিয়তম স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অপরিচিত নূতন স্থানে গিয়া বাস করি? আমাদের পৈতৃক জন্মভূমি যে আমাদের স্বর্গাধিক পুণ্যতম মহাতীর্থ।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম,—আমাদের সে পিতা-মাতা ও জ্ঞাতি-বন্ধুরা পরলোক গমন করিয়াছেন, তবে

আর কাহার মায়ায় এ জীবনসঙ্কট স্থানে বাস করি? কিন্তু হায়! দুর্বুদ্ধিবশতঃ তুমি আমার সৎপরামর্শ শুন নাই। এখন দেখ! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সময়ে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলে আজি কি এ সর্ব্বনাশ ঘটিত? অথবা ইহা কেবল আমারি বিনাশের জন্য ঘটিল! আমি জীবিত থাকিয়া, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, আমার জননীতুল্যা হিতকারিণী, প্রাণপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীকে মৃত্যুমুখে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ভার্য্যাকে মানবের শ্রেষ্ঠ সখা ও একমাত্র গতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নিসমক্ষে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, সুপবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক, যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, পবিত্র মহাবংশে যাহার জন্ম, যাহার পুণ্যময় চরিত্র অতুলনীয়, যে ভার্য্যা পতিপ্রাণা, গৃহস্থাশ্রমের মূলবন্ধন, বিশেষতঃ সন্তানজননী, সেই নিরপরাধা সতীকে নিজ জীবনের মমতায় কৃতান্তহস্তে নিক্ষেপ করিতে পারিব না। কোন্ প্রাণেই বা আমাদের এ জীবনসর্ব্বস্ব, হৃদয়ানন্দ শিশুসন্তানটীকে কালকবলে অর্পণ করি? এ শিশু ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। আমাদের রোদন দেখিয়া, "বাবা! কাঁদিস্ কেন? মা! কাঁদিস্ কেন?" বলিয়া বারংবার ছলছল নেত্রে আমাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে!

প্রাণপ্রতিমা কন্যাটীকেই বা কোন্ প্রাণে রাক্ষসমুখে অর্পণ করি? সৎপাত্রে দান করিবার জন্যই বিধাতা ইহাকে আমাদের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। পিতৃলোকেরা পুত্রের ন্যায় দৌহিত্রের হস্তেও জলপিণ্ডের কামনা করেন। আমি জন্মদাতা

হইয়া সেই নিরপরাধা বালিকাকে কিরূপে রাক্ষসমুখে পরিত্যাগ করি? কেহ বলে,—পিতার স্নেহ পুত্রের উপরেই অধিক; কেহ বলে,—পিতার স্নেহ কন্যার উপরেই অধিক। কিন্তু আমার নিকট পুত্র ও কন্যা উভয়ই সমান স্নেহাস্পদ। আমি নিজ জীবন দান করিলেও, পরলোকে গিয়া বিষম অনুতাপ পাইব। কেননা, আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া গেলে ইহারা কেহই বাঁচিবে না, নিরাশ্রয় হইয়া সকলেই মারা পড়িবে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব নৃশংস ও গর্হিত কার্য্য। প্রাণান্তেও তাহা করিতে পারিব না! অহহ! কি ভয়ানক বিপদে পড়িলাম! এ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোনও উপায় নাই। হায় হায়! আজি সপরিবার আমার কি দশা ঘটিল! যদি মরিতে হয়, সকলেই একসঙ্গে মরিব। ইহাদের একটীরও বিচ্ছেদ সহিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণের ঐ সকল খেদোক্তি শুনিয়া, ব্রাহ্মণী কহিলেন,—হে নাথ! ইতর মানবের ন্যায় এ সময় তোমার সন্তাপ করা উচিত নয়। তুমি জ্ঞানী, ও পরিণামদর্শী, এ তোমার সন্তাপ করিবার সময় নয়। এ সংসারে সকলকেই মরিতে হইবে। অতএব অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে সন্তাপ করিয়া কি ফল? পত্নী, পুত্র বা কন্যা সকলি মানবের আত্মার্থে। অতএব তুমি আত্মাকে রক্ষা কর। আমি তোমাদের জন্য নিজ প্রাণ পরমানন্দে দান করিতেছি। তুমি মর্ম্মবেদনা পরিত্যাগ কর। আমি সে স্থানে স্বয়ং যাইতেছি। প্রাণ দিয়া স্বামীর হিতসাধনই রমণীর সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ধর্ম্ম। আমার প্রাণদানে তোমাদের সকলের প্রাণরক্ষা হইবে এবং ইহলোকে আমার কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই পরম ধর্ম্ম ও একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে তোমার সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। যে জন্য লোকে ভার্য্যার কামনা করে, পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করায় আমাদ্বারা তোমার সে কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। আমার গর্ভে তোমার পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করায়, তুমি আমাকে ঋণমুক্তা করিয়াছ। আরো দেখ! তুমি জীবিত থাকিলেই, এই কুলরক্ষানিদান পুত্র-কন্যা জীবিত থাকিবে। তুমিই ইহাদের ভরণ-পোষণে সমর্থ। কি সাধ্য, আমি একাকিনী ইহাদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষা করিতে পারি। হে সর্ব্বেশ্বর! তোমাকে হারাইলে আমি বাঁচিব না, এ পুত্র-কন্যাও বাঁচিবে না। তোমার অভাবে এ অনাথা অবলা, এ শিশুসন্তানদুটীকে কিরূপে রক্ষা করিবে? অহঙ্কৃত দুর্ব্বৃত্ত লোকে, সুযোগ পাইয়া, নিশ্চয়ই এ কন্যাকে প্রার্থনা করিবে। দুর্ব্বলা অবলা কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করিবে? যেমন ভূপতিত মাংসখণ্ডকে মাংসলোলুপ পক্ষীরা হরণ করে, তেমনি পতিহীনা অনাথাকে হরণ করিবার জন্য দুষ্টলোকে চেষ্টা করে। সে সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে আমি আত্মাকে ও কন্যাটীকে কিরূপে রক্ষা করিব? সে অবস্থায় আমার আত্মঘাতিনী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে? অতএব ভাবিয়া দেখ! তোমার অভাবে আমাদের সকলদিকেই সর্ব্বনাশ! তোমার বংশধর এই শিশুটীকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা-

দান পূর্ব্বক পিতৃপিতামহের কুলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা না করিয়া গেলে, এবং এই প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে সংপাত্রে দান পূর্ব্বক, ইহার চিরজীবনের কল্যাণ সাধন না করিলে, তোমাকে নিরতিশয় প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। প্রাণান্তেও আমি তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে দিব না। আর নাথ! ইহাও অবধারিত জানিও,—আমি তোমাকে হারাইয়া ক্ষণমাত্রও বাঁচিব না। সুতরাং একমাত্র তোমার অভাবে এ পরিবার নির্ম্মূল হইবে। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত কর্ত্তব্য। ইহাই বংশের, তোমার, আমার ও পুত্র-কন্যার, সকলেরি পক্ষে সর্ব্বাংশে কল্যাণকর। হে নাথ! ইহাতে আর দ্বিধা করিও না। আমাকে প্রসন্নচিত্তে আদেশ কর, আমি সে রাক্ষসের ভক্ষ্যরূপে তথায় যাইতেছি। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব পুত্র, কন্যা, দুটীকে দেখিও। আমি তোমার প্রসাদে যথেষ্ট সুখশান্তি সম্ভোগ করিয়াছি, তোমার কৃপায় প্রাণারাম পুত্র-কন্যা দর্শন করিলাম, যাহা কিছু সংসারে প্রিয় পদার্থ, সে সকলি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার কার্য্যে এ নশ্বর, তৃণকণার ন্যায় অসার জীবন বিসর্জ্জন করিলে, আমার জীবনসৌভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হয়। অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আত্মাকে, এ কুলকে ও কুলাতন্তু পুত্র-কন্যাকে রক্ষা কর। পত্নীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সেই পতিপ্রাণা সতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের কন্যা, পিতা-মাতাকে সেইরূপ বিহ্বলভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া, মনোদুঃখে অধীরা হইল, এবং সজল-নয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা অনাথের ন্যায় এমন কাতর-ভাবে কাঁদিতেছ কেন? যদি একজন প্রাণ দিলেই আর সকলের প্রাণরক্ষা হয়, তবে আমি প্রাণ দিব। সেই ত আমাকে পরহস্তেই পরিত্যাগ করিতে হইবে, কন্যার সঙ্গে ত পিতা-মাতার চির-সম্পর্ক থাকে না। দুইদিন পরে অবশ্যই যাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে এ সময় পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সকলের প্রাণরক্ষা কর। পিতা-মাতা ত এই জন্যই সন্তানকামনা করেন, যে, এ আমাকে বিপদে রক্ষা করিবে। অতএব, এ বিপদ্-সাগর, আমাকেই ভেলাস্বরূপ করিয়া তোমরা উত্তীর্ণ হও, আমার এ ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হউক। তোমরা বাঁচিলে আমার উভয় কুল রক্ষা পাইবে। আরো দেখ! আমাদের কুলসর্ব্বস্ব,—আমার প্রাণাধিক এই শিশু ভাইটী, তোমাদের বিরহে কতক্ষণ বাঁচিবে? অচিরেই ইহার প্রাণবিয়োগ হইবে। আমার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা বিনষ্ট হইলেই ত আমাদের বংশ-লোপ হইল, পিতৃলোকের জলপিণ্ড এককালে বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর কি আছে? আমার পিতা-মাতার ও ভ্রাতার বিনাশেও কি আমি বাঁচিব? ভীষণ যন্ত্রণায় আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। বাবা! মা! তোমরা সুস্থশরীরে জীবিত থাকিলে ও আমার এই প্রাণের ভাইটী কুশলে থাকিলে, আমাদের সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। এ বংশের স্থিতি, ঐহিক

ও পারত্রিক কল্যাণ, সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পুত্র, পিতার আত্মা; ভার্য্যা, পতির সমদুঃখভাগিনী এবং ইহলোকের ও পরলোকের বন্ধু। এজন্য সর্ব্বত্যাগ স্বীকার করিয়াও, ভার্য্যা ও পুত্র রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কন্যাসন্তান পিতা-মাতার কেবল দুঃখেরই কারণ। জামাতা কুপথগামী বা দরিদ্র হইলে, বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহাদের মনোবেদনার পরিসীমা থাকে না। তখন তাঁহারা যাতনায় অস্থির হইয়া নিজ মৃত্যু কামনা করেন; অধিক কি, তাঁহাদের সেই হৃদয়সর্ব্বস্ব কন্যারও মৃত্যু কামনা করেন। অতএব, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, এ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হও। প্রাণাধিক পিতা-মাতা ও ভ্রাতার জন্য প্রাণদান করিব, এ আনন্দে আমার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। তোমরা কিছুতেই এ সঙ্কল্প হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তোমাদের প্রাণরক্ষাই আমার পরম ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে আমাকে বঞ্চিত করিওনা। তোমরা গেলে, আমার কি দশা ঘটিবে? আমি কার কাছে দাঁড়াইব? কে আমাকে আশ্রয় দিবে? তোমাদের জন্য জীবন দিয়া আমি অক্ষয় ও অমৃতময় দিব্য জীবন লাভ করিব। অতএব, এ অবশ্যকর্ত্তব্যে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব করা উচিত নয়। আমি এখনি যাইতেছি, আমাকে বাধা দিও না। কন্যা এইরূপ কাতরবাক্য বলিতে বলিতে পিতা-মাতার চরণ ধরিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং নির্ব্বন্ধসহকারে বারংবার নিজ প্রাণদানের জন্য তাঁহাদের আদেশ ভিক্ষা করিল। সেই ব্রাহ্মণদম্পতী শোকোন্মত্ত হইয়া, স্নেহ-

নির্ভরে সেই প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই শিশুপুত্রটী পিতা-মাতাকে ও ভগিনীকে সেইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া, যেন কি এক সাহসে উৎফুল্লনয়ন হইয়া, আধ-আধ মধুর বাক্যে বলিল,—মা-মা! বাবা-বাবা! দিদি-দিদি! তোরা কাঁদিস্ কেন? বালক এই কথা বলিতে বলিতে, বারংবার তাহার পিতা-মাতা, ও ভগিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর, সে একটী কাটি লইয়া, তাহা দেখাইয়া সদর্পে কহিল,—তোরা আর ভয় করিস্ না, আমি এখনি সেই রাক্ষসটার কাছে যাইতেছি, ইহার আঘাতে সেই দুষ্ট রাক্ষসবেটাকে মারিয়া ফেলিব।

অহো! শিশুবাণীর কি মোহিনী শক্তি! বালকের সেই কথা শুনিয়া, সেই সর্ব্বনাশের সময়েও, তাহার পিতা, মাতা ও ভগিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। সেই সরল শিশুর সুধামাখা স্নেহ ও সাহসের কথা শুনিয়া, সকলেই যেন ক্ষণকালের জন্য সে বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন, সেই মৃতকল্প পরিবারের শোকবিহ্বল হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য হর্ষের উদয় হইল।

মহামনা কুন্তীদেবী তাঁহাদের অদূরে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের সম্মুখে গমন করিলেন, এবং সেই শোকজ্বলিত পরিবারের প্রাণে যেন অমৃতবর্ষণ করত কহিলেন,—আজি আপনাদের কি বিপদ্ উপস্থিত, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। তাহার প্রতীকার যদি সাধ্য হয়, তবে তাহা আমি নিশ্চয় করিব। তাঁহার সেই কথা

শুনিয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ভদ্রে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা আপনার ন্যায় দয়াবতী, মহাপ্রাণা রমণীর উপযুক্ত কথা। কিন্তু এ বিপদের প্রতীকার মনুষ্যের অসাধ্য। এই নগরের সমীপে বকনামে এক রাক্ষস বাস করে। সেই দুর্জ্জয়, মহাবল রাক্ষসই এ প্রদেশের হর্ত্তা, কর্ত্তা। তাহার শাসনে সকলকে চলিতে হয়। সে নিজ অনুচর রাক্ষসবর্গের সহিত এ দেশ শাসন করিতেছে। সেই দুর্জ্জয় নরখাদক নিত্য নরমাংসে দেহ পোষণ করিতেছে। তাহার প্রভাবে সকলেই ভীত। এ দেশের রাজা তাহার ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছেন। ক্রমে এই দেশের সকলেই তাহা কর্ত্তৃক কবলিত হইবে। তাহার রাজকরস্বরূপ প্রতিদিন এক ভার পায়স-পিষ্টকাদি-সহ অন্ন, দুইটী মহিষ ও একটী মনুষ্য তাহার নিকট পাঠাইতে হয়। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন এইরূপে তাহার আহার যোগাইতে হয়। কোনও গৃহস্থ, তাহার পালার দিন, যদি তাহার নিকট এ সকল দ্রব্য যথাসময়ে উপস্থিত না করে, তবে সেই দুরাত্মা রাক্ষস তাহাকে ও তাহার সমস্ত পরিবারকে ভক্ষণ করে। বহু-কালের পর আজি আমাদের পালা উপস্থিত। আজি তাহার জন্য একটী মনুষ্য ও অন্নাদি আমাকেই দিতে হইবে। আমার অর্থ নাই যে, তদ্দ্বারা মনুষ্য ও মহিষাদি ক্রয় করিয়া দিব। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মধ্যে কাহাকেও রাক্ষসমুখে আমি প্রাণান্তেও দিতে পারিব না। অহো! আজি আমাদের কি সর্ব্বনাশের দিন! এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায়

নাই। তাই, আমি সপরিবার এক সঙ্গে সেই রাক্ষসের ভক্ষ্য হইব স্থির করিয়াছি। কেন না, দেখিতেছি, আমাদের একের অভাবে সকলেই মরিবে। এস্থলে যুগপৎ সকলেরি প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়।

পরদুঃখকাতরা, মনস্বিনী কুন্তী ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া কহিলেন,—আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার ভয় নাই। দেখুন! আপনার একমাত্র শিশুপুত্র ও একটী বালিকা কন্যা। ইহাদের কাহারও প্রাণদান করা উচিত নয়। আপনি বা আপনার পত্নী বিনষ্ট হইলে, আপনার এ পুত্র, এ কন্যা বাঁচিবে না। অতএব আমার পুত্র বলি লইয়া রাক্ষসের সকাশে গমন করুক। আমার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে একটীকে হারাইলে আমি পুত্রহীনা হইব না। আমার চারি পুত্র বিদ্যমান থাকিবে। এ প্রস্তাবে আপনারা দ্বিধা করিবেন না। আমি প্রসন্নচিত্তে এখনি আমার পুত্রকে বলি লইয়া সেই রাক্ষসের নিকট যাইতে আদেশ করিতেছি। এ আজ্ঞা আমার পুত্র পরমানন্দে পালন করিবে। যদি পুত্রকে বা আত্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া আশ্রয়দাতার উপকার না করিলাম, তবে বৃথাই আমার মহাবংশে জন্ম। ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—না ভদ্রে! এমন কথা আপনি মুখেও আনিবেন না। এরূপ কার্য্য আমি কদাচ করিতে দিব না। আপনারা ব্রাহ্মণ, আমার গৃহে বাস করিতেছেন। আমি নিজ প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রিত ব্রাহ্মণের প্রাণসংহার করিব? হা ঈশ্বর! স্বার্থের জন্য ঈদৃশ পাপবুদ্ধি যেন আমাদের কল্পনাতেও

উপস্থিত না হয়। আপনাদের ন্যায় অভ্যাগত জনের রক্ষার জন্য বরং আমাদেরই প্রাণদান করা উচিত। আশ্রিতের হত্যা অপেক্ষা আত্মহত্যাকে আমি সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করি। গৃহাগতের হত্যা অপেক্ষা ঘোরতর মহাপাপ আর কিছুই নাই। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ পাপের ফল অনন্ত নরক। লোক-ধর্ম্ম-বিদ্বিষ্ট এ মহাপাপের কথা মনে করিলেও, নিরয়গামী হইতে হয়। আজি সপরিবার আমারি মৃত্যু শ্রেয়। আমি কিছুতেই আপনাদের কাহাকেও প্রাণদান করিতে দিব না। এরূপ অনুরোধ আর করিবেন না। তাঁহার কথা শুনিয়া কুন্তী কহিলেন,—মহাশয়! আমি এ ব্রাহ্মণপরিবারকে রক্ষা করিবই, ইহা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানিবেন। আর, আপনি আমার পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কাই বা করিতেছেন কেন? আমি আমার পুত্রগণের যোগ্যতার বিষয় জানি। সাধ্য কি, রাক্ষস আমার পুত্রের প্রাণসংহার করে। আর যদি, আশ্রয়দাতার প্রাণরক্ষার জন্য আমার এ জীবনসর্ব্বস্ব পঞ্চপুত্রেরই প্রাণ যায়, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করিব না, বরং 'বীরমাতা' বলিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। যে সন্তান আর্ত্তত্রাণের জন্য নিজ জীবনকে তৃণতুল্য বিসর্জ্জন করিতে না পারে, সেরূপ কুলাঙ্গার কুসন্তানকে কোনও রমণী যেন গর্ভে ধারণ না করেন। আপনারা আর ভয় বা শোক করিবেন না। দেখিবেন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুত্র সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে সংহার করিয়া এ দেশকে নিরুপদ্রব করিবে। ওরূপ কত

রাক্ষস আমার পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছে। অতএব আপনারা সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক হউন। কিন্তু দেখিবেন, এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও যেন অন্যে জানিতে না পারে। এ কথা প্রকাশ পাইলে, আমার পুত্রগণের অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

কুন্তীদেবীর সেই অভয়বাণী, সঞ্জীবনীসুধার ন্যায় সেই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণপরিবারকে জীবন দান করিল। অনন্তর কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের সহিত ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন। কুন্তী পুত্রকে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বলিলেন। ভীম শ্রবণ-মাত্র জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কহিলেন,—মা! কোনও চিন্তা নাই। আমি এখনি আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি। অনন্তর ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—মহাত্মন্! আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কুন্তীর আর চারি পুত্র ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীমের আকার প্রকার দেখিয়াই বুঝিলেন, যে, ভীম আজি কোনও অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত। অনন্তর তিনি মাতাকে বিজনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! আমি আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি, এই ভীমপরাক্রম ভীমসেন আজি কোনও সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত। মা! ভীম যে কার্য্য করিবে, তাহা তোমার আদেশে, অথবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতেছে?

কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীম আমারি আজ্ঞায় সে কার্য্য

করিবে। ভীম আজি কোনও মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত। সে কার্য্য দ্বারা এ বিপন্ন ব্রাহ্মণপরিবারের ও নগরবাসী সমস্ত লোকের জীবনরক্ষা হইবে। ইহা বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—মা! তুমি এ অতি দুষ্কর ও ভয়ানক কার্য্যে ভীমকে নিযুক্ত করিয়াছ। জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা বিচারসঙ্গত কার্য্য নহে। জননী হইয়া, মা! তুমি কোন্ প্রাণে, পরের জন্য, আপন সন্তানকে কালকবলে বিসর্জ্জন করিতেছ? এ কার্য্য লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ। দেখ মা! যাহার ভুজবীর্য্যের ছায়ায় আমরা সুখে শয়ন করিতেছি, যাহার বাহুবল সর্ব্বসঙ্কটে আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আমাদের ব্যসনসাগরে তরণী, যাহার প্রভাবে আমরা দুর্য্যোধনাদি সেই নীচাশয়গণকে সংহারপূর্ব্বক আমাদের অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আশা করি, যে অমিততেজা বীরের শৌর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি বৈরীরা দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় নিদ্রা যায় না, যে ভীম একাকী সেই ভীষণ নিশীথে আমাদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া, জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আমরা অশেষ সঙ্কট হইতে যাহার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইতেছি, তুমি মা হইয়া কোন্ বুদ্ধিতে সেই মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃগতপ্রাণ, আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার মূলবন্ধন তনয়কে রাক্ষসকবলে সমর্পণ করিতেছ? জননি! নানা বিপদের বিক্ষোভে তোমার ত বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই? নতুবা মা হইয়া নিতান্ত দুঃশীল সন্তানকেও কেহ

মৃত্যুহস্তে অর্পণ করিতে পারে না। কুন্তী কহিলেন,—বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি ভীমের জন্য ভয় বা সন্তাপ করিও না। এ আমার বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যের কার্য্য নহে। আমি বিবেচনা করিয়াই প্রসন্নচিত্তে এ কার্য্যে ভীমকে নিযুক্ত করিয়াছি। দেখ বৎস! দীর্ঘকাল এই ব্রাহ্মণগৃহে আমরা পরম সুখে বাস করিতেছি। ইহাঁরা পরম যত্নে আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই ধার্ম্মিক পরিবারের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ। আজি ভগবৎ-কৃপায় আমরা ইহাঁদের উপকারপরম্পরার প্রতিদানের সুযোগ পাইয়াছি। কৃতঘ্ন না হইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বপ্রযত্নে উপকর্ত্তার প্রত্যুপকার করাই মনুষ্যত্ব। যদি কেহ একগুণ উপকার করে, তবে তাহার সহস্রগুণ প্রত্যুপকার করিলেও মনের ক্ষোভ মিটে না। একাকী যে ভীম সেই ভীষণ জতুগৃহ-সঙ্কটে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, দুর্জ্জয় হিড়িম্ব রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে, তাহার দেহে অযুত মত্তহস্তীর বল। বৃকোদরের তুল্য বলশালী কে আছে? স্বয়ং বজ্রধর সুরপতিকেও ভীমের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। ভীমের বলবীর্য্য আমার অগোচর নয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভীম রাক্ষস সংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আসিবে। অতএব আমি মোহবশতঃ এ সঙ্কল্প করি নাই। আমি এ শুভ সঙ্কল্প বুদ্ধিপূর্ব্বক করিয়াছি। বৎস! এ কার্য্য দ্বারা উপকর্ত্তার ঋণমোচন ও বিপন্নপরিত্রাণরূপ মহাপুণ্য অনুষ্ঠিত হইবে। অধিক কি বলিব? বৎস! এরূপ সৎকার্য্যের জন্য

যদি আমার পঞ্চপ্রাণবায়ুস্বরূপ পঞ্চপুত্রকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি কাতর হইব না। আমি উহাদিগকে অভয়দান করিয়াছি, সে সত্য পালন করিবই।

মহাপ্রভাবা জননীর ঐ সকল কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—মা! তুমি এই বিপন্ন পরিবারের প্রাণরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় যাহা করিতেছ, তাহা তোমার ন্যায় মনস্বিনী বীরাঙ্গনার উপযুক্ত কার্য্য। মা! তোমার আশীর্ব্বাদে ভীম নিশ্চয়ই সেই নরান্তক দুরাত্মাকে বধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু দেখিও, যাহাতে এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতে না পারে, সাবধানে তাহা করিতে হইবে। এ ব্রাহ্মণপরিবারকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও।

অনন্তর ভীমসেন যথাসময়ে অন্ন প্রভৃতি বলিদ্রব্য লইয়া অরণ্যে সেই রাক্ষসের বাসস্থানে গমন করিলেন। তিনি শিলাতলে অন্নাদি স্থাপনপূর্ব্বক, তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন, এবং রাক্ষসের নাম ধরিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভীমের তাদৃশ সদর্প আহ্বানধ্বনি শুনিয়া, রাক্ষস মহাক্রোধে আসিতে লাগিল। তাহার পদভরে মেদিনী কম্পমানা ও তাহার গাত্রসংঘর্ষে মহাবৃক্ষসকল চূর্ণ হইতে লাগিল। তাহার চক্ষু প্রজ্বলিত অলাতচক্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ও বিঘূর্ণিত, কেশ ও শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, কর্ণদ্বয় বৃহৎ-শূর্পাকার, বৃহৎ ও বিবৃত আস্য আকর্ণব্যায়ত। তাহার দন্ত হইতে ভীষণ কটকটা শব্দ উত্থিত হইতেছিল। সেই করালমূর্ত্তি কৌণপ

ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটী বদ্ধ করিয়া, বারংবার নিজ ওষ্ঠ দংশন করত, বিস্ফারিত লোচনে ক্রোধভরে কহিল,—কোন্ দুরাত্মা আমার অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? এই দণ্ডেই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। ভীম সে কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন, রাক্ষসের দিকে দৃক্পাতও করিলেন না, স্বচ্ছন্দে সেই অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভীষণ গর্জ্জনে বনভূমি কম্পিত করিয়া, স্তম্ভসদৃশ, মুষ্টিবদ্ধ দুই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক, প্রলয়বেগে ভীমের প্রাণসংহার জন্য ধাবিত হইল। ভীম যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, আপন মনে সেই উপাদেয় অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ক্রোধে পূর্ণ হইয়া, ভীমের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। ভীম অবিচলিত, রাক্ষসের দিকে তাঁহার দৃক্পাতও নাই, স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতেছেন। তখন রাক্ষস অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিল, এবং ভীমকে মারিবার জন্য মহাদম্ভে আসিতে লাগিল। তথাপি ভীমের ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন তাঁহার ভোজন সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি আচমন পূর্ব্বক সহাস্যমুখে বামহস্ত দ্বারা রাক্ষসনিক্ষিপ্ত সেই মহাবৃক্ষ ধারণ করিলেন। রাক্ষস রোষে উন্মত্ত হইয়া, মহাবৃক্ষসকল উৎপাটনপূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে ভীমের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভীমও তাহার উপর বৃক্ষাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই লোমহর্ষণ নর-রাক্ষস-সংগ্রামে ক্রমে বনভূমি বৃক্ষশূন্য হইল। রাক্ষস তখন প্রলয়বেগে আসিয়া

ভীমসেনকে দুই বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। ভীমও যমপাশসদৃশ নিজ ভুজপিঞ্জরে রাক্ষসকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের দেহসজ্ঘর্ষে ধরণী কম্পান্বিতা ও পাদপসকল বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসের বলক্ষয় হইতেছে দেখিয়া, ভীম তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন, বজ্রমুষ্টি দ্বারা তাহাকে নিদারুণ আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহাকে অধোমুখে পাতিত করিয়া, জানুদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিলেন, এবং এক হস্তে তাহার কটিদেশ ও অন্য হস্তে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক এরূপ ভীষণভাবে আকর্ষণ করিলেন, যে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় তাহার দেহ সশব্দে ভগ্ন হইয়া গেল। রাক্ষস বিকটনাদে রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। সেই পর্ব্বতাকার, ভগ্নকলেবর রাক্ষস মৃত্যুকালে যে বিকট আর্ত্তনাদ করিল, তাহাতে তদীয় জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিজনেরা ভীত হইয়া তথায় আগমন করিল, এবং সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে প্রাণভয়ে কাতর হইয়া ভীমের শরণাপন্ন হইল। ভীম কহিলেন,—যদি তোমরা অতঃপর এক প্রাণীরও হিংসা কর, তবে তোমাদিগকে সমূলে সংহার করিব। তাহারা প্রাণভয়ে তাহা অঙ্গীকার করিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তদবধি সে স্থান নিরুপদ্রব হইল। অনন্তর ভীম সেই রাক্ষসের মৃতদেহ নগরদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া, অলক্ষিতভাবে স্বস্থানে আগমন করিলেন। ক্রমে আবালবৃদ্ধবনিতা নগরবাসীরা,

রাক্ষস হত হইয়াছে জানিয়া, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে দলে দলে আসিয়া সেই বিকটাকার রাক্ষস-দেহ দর্শন করিল, এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে লাগিল,—অহো! এ কার্য্য নিশ্চয়ই কোনও দেবতা কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। অবিলম্বে সেই ঘটনার কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। মহোল্লাসে সকলে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে লাগিল। গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব হইল। পাণ্ডবেরা অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

মহাভারতের কথা।

ঘোরতর কৃতঘ্নের প্রতি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমা ও দয়া।

দাক্ষিণাত্যবাসী গৌতম নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ একদা ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে, এক ম্লেচ্ছরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্রহ্মবর্জ্জিত চণ্ডালদেশে কেবল দস্যুগণের বাস। এক সমৃদ্ধিশালী দস্যুর আলয়ে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিল। গৃহস্বামী চণ্ডাল হইলেও অতিশয় আতিথেয় ছিল (১)। সে পরম যত্নে সেই ভিক্ষার্থী অভ্যাগতের সৎকার করিল।

(১) আতিথেয়তাধর্ম্মটী পূর্ব্বে এ দেশের দস্যু-চণ্ডালেও পালন করিত। দস্যু, চণ্ডাল, শবর, কিরাত, ব্যাধ, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, প্রভৃতি শব্দ সচরাচর সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রায় একার্থে ব্যবহৃত হয় ইহারা পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় স্থানে বাস করে। পশুমারণ ও পরস্বহরণ প্রভৃতি ইহাদের জীবিকা।

অনন্তর তাহাকে নিরাশ্রয় জানিয়া, সেই স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলে, দস্যু তদীয় বাসোপযোগী গৃহ ও গৃহসামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রদান পূর্ব্বক, তাহাকে সেই স্থানে বাস করাইল। ব্রাহ্মণকে তথায় স্থায়ী করিবার জন্য, দস্যু তাহার বার্ষিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিল, এবং এক বিধবা চণ্ডালযুবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে স্বজাতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মণ, চণ্ডালদেশে বাস করিতে করিতে ক্রমে চণ্ডালপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। নিষ্পাপ পশু, পক্ষী ও নিরীহ পথিকগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আত্মপোষণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা তাহার স্বদেশীয় এক ব্রাহ্মণ, ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া, দৈবঘটনায় সেই ম্লেচ্ছদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সেই দস্যুসমাকীর্ণ স্থানে সাধু লোকের আবাস অন্বেষণ করিতে করিতে, অবশেষে সেই স্বদেশীয়, পরিচিত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৌতমও সেই সময়ে পশু, পক্ষী বধ করিয়া বন হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ, স্কন্ধে পশু-পক্ষীর মাংসভার, এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত। চিরপরিচিত গৌতমকে রাক্ষসের ন্যায় বীভৎসবেশে আসিতে দেখিয়া, অভ্যাগত ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—ওরে কুলাঙ্গার! তোর একি দুর্দ্দশা! তুই না আমার স্বদেশীয় সেই চিরপরিচিত গৌতম? হায়! তুই পবিত্র

ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, কর্ম্মদোষে এককালে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিস্! তোর ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃলোক ও জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করিয়া দেখ! তোর কুলোচিত সদাচারপরম্পরা স্মরণ করিয়া দেখ! তোর দুর্গতি দেখিয়া দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তিনি এইরূপে তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, এবং স্বদেশে গিয়া পুনরায় সদাচারে থাকিবার জন্য বিস্তর বুঝাইলেন। গৌতম শেষে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিল, আমি কল্যই এ চণ্ডালসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিব। ধনলোভেই আমার এ দুর্গতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আপনার তিরস্কারে আমার চৈতন্য হইল, আজি আপনার দর্শনলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম।

অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সে রাত্রি গৌতমের গৃহে বাস করিলেন বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্মচণ্ডালের প্রদত্ত অন্ন-জল স্পর্শও করিলেন না। রাত্রি প্রভাত না হইতেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গৌতমও প্রত্যূষে উঠিয়া সেই দস্যুদেশ ত্যাগ করিয়া, সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে দেখিল, এক দল বণিক্ সমুদ্রযাত্রায় চলিয়াছে। গৌতম ধনলাভের চেষ্টায় তাহাদের সমভিব্যাহারে চলিল। তাহারা যেমন এক গিরি-গহ্বর পার হইবে, অমনি এক মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বণিক্‌দলের প্রায় সকলেই হত হইল। গৌতম প্রাণভয়ে দৌড়িতে দৌড়িতে বহুদূরে গিয়া, এক রমণীয় বনভূমি প্রাপ্ত হইল।

সেই বনভূমি অতি প্রশান্ত ও পবিত্র। বিচিত্র ফলপুষ্পের শোভায় যেন তাহা নন্দন-লক্ষ্মী বিস্তার করিয়াছে। যেন তাহা অমৃতময় সত্ত্বরসে নিরন্তর আর্দ্র রহিয়াছে। প্রতিপলকেই যেন তাহা হইতে অপূর্ব্ব শান্তি ও করুণা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। শান্তি-দেবীর মধুময় নিশ্বাসবায়ুর ন্যায় দিব্য গন্ধবহ সঞ্চারিত হইয়া, তত্রত্য প্রাণিমাত্রেরই আত্মাকে পুলকিত করিতেছে। মকরন্দনিস্যন্দে অভিষিক্ত থাকায়, তরুলতাসকল যেন ভূত-করুণায় দ্রবীভূত হইতেছে। উন্মদ বিহঙ্গকুলের মধুময় কলকলে বনস্থলী উচ্ছলিত হইতেছে, যেন পতত্রিকুল প্রেমোন্মত্ত হইয়া, প্রমুক্তকণ্ঠে সেই রাজরাজেশ্বর বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত কাননভূমি যেন তপ্তকাঞ্চনময়ী; তাহার অভ্যন্তর হইতে যেন এক শান্ত, পাবন, অচিন্ত্য, অপার্থিব বৈভব নিষ্ঠ্যূত হইতেছে। বিশ্ববিধাতা যেন সেই বনভূমিকে সর্ব্বপ্রাণীর জননীরূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ; সুমেরু-শিখরের ন্যায় তাহার চূড়া ঊর্দ্ধলোক স্পর্শ করিয়াছে। তাহার দিগন্তব্যাপিনী অসংখ্য শাখা দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন আশ্রয়ার্থি-গণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বয়ং বিরাট্ পুরুষ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

প্রাণভয়ে, পরিশ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় গৌতম মৃতকল্প হইয়াছিল। সেই তরুবরের সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইল। সেই বৃক্ষে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক দিব্যপ্রভাব বকরাজ বাস করিতেন। তিনি সায়ংকালে

আবাসবৃক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তরুতলে একজন অভ্যাগত ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তির হিংসাপূর্ণ, পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণিমাত্রকেই চমকিত হইতে হয়, কিন্তু তাহাকে বিপন্ন ও শরণাগত জানিয়া আতিথেয় পক্ষিরাজের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে সাধো! আজি আমার কি সৌভাগ্য! আমি ভবাদৃশ প্রিয়তম অতিথির সমাগম লাভ করিলাম। আপনি ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে অবসন্ন হইয়াছেন, এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। এ রাত্রি আমার আলয়ে অবস্থান করুন, কৃপা করিয়া এ ভক্তজনের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি প্রাণপণ যত্নে আপনার শুশ্রূষা করিতেছি। আপনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিবেন।

কশ্যপতনয় শকুন্তরাজের অমৃতায়মান সম্ভাষণে গৌতম উঠিয়া বসিল। পক্ষীও তাহার যথাবিধি পূজা করিয়া, তাহার জন্য দিব্য পুষ্পময় আসন ও সুমধুর ফল, জল আহরণ করিলেন, এবং পরম যত্নে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। অতিথি আহারে ও পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইলে, তিনি কুসুম-বাসিত, কোমল কিশলয়শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, পক্ষপুটে বীজন করিতে করিতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৌতম কহিল, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার নিবাস মধ্যদেশে। ধনলাভের প্রত্যাশায় সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত

হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়া এ স্থানে আসিয়াছি। পক্ষিরাজ কহিলেন,—মহাত্মন্। আপনি আমার পরম প্রীতি-পাত্র অতিথি। আপনি পূর্ণকাম হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। যাহাতে আপনার প্রভূত অর্থলাভ হয়, আমি তাহার উপায় করিয়া দিব।

গৌতম পরমাহ্লাদে রাত্রিযাপন করিয়া, প্রভাতে যখন গমন করে, তখন নাড়ীজঙ্ঘ তাহাকে কহিলেন,—হে সৌম্য! এই পথ দিয়া গমন করুন। এ স্থান হইতে তিন যোজন দূরে মেরুব্রজ নামে এক নগর আছে; তথায় বিরূপাক্ষ নামে এক পরাক্রান্ত রাক্ষসপতি বাস করেন। তিনি আমার পরমবন্ধু ও অতি বদান্য। আপনি আমার নাম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সমাদর পূর্ব্বক আপনার আতিথ্য করিবেন, এবং প্রচুর ধনদানে আপনাকে পরিতুষ্ট করিবেন। গৌতম, পক্ষিরাজের উপদেশক্রমে সেই রমণীয় বনভূমি অতিক্রম করিয়া মেরুব্রজে উপস্থিত হইল। রাক্ষস-পতি, প্রিয়বন্ধুর নিকট হইতে অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া, স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং স্বগৃহে লইয়া গিয়া বিবিধ বিধানে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; জাতিতে রাক্ষস হইলেও দানে সাক্ষাৎ কল্পতরু (১)। যে দিন গৌতম তথায়

(১) পূর্ব্বকালে এ দেশের দস্যুগণের দানধর্ম্মের প্রমাণ ভূরিং প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিখ্যাত রঘু ডাকাতের বদান্যতার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

উপস্থিত হইল, সে দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সেই শুভ পৌর্ণমাসীর দিনে তদীয় দানধর্ম্ম, চন্দ্রমার ন্যায়, যেন ষোল কলায় পূর্ণ হইল; তদীয় পুণ্যরাশি যেন অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইল।

ঐ সকল পুণ্য তিথিতে অসংখ্য দীন দরিদ্র ব্যক্তি নানা দেশ হইতে তথায় আগমন করিত। রাজাজ্ঞায় রাজ্যমধ্যে কেহ প্রাণিহিংসা করিতে পারিত না। মনুষ্যে ও রাক্ষসে মিলিত হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিত। সকলই যেন আনন্দময়, উৎসবময়, আলোকময় ও পুলকময় বলিয়া বোধ হইত।

রাক্ষসপতি অভ্যাগতমাত্রকেই দানে, মানে ও প্রীতিভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর বন্ধু-প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণকে বহুমূল্য কনকরাশি দান করিয়া যথোচিত সম্মান সহকারে বিদায় করিলেন। গৌতমও সেই গুরুতর স্বর্ণভার অতি কষ্টে বহন পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল।

গুরুভারবহনে প্রপীড়িত এবং ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া, গৌতম পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ পুনরায় সেই বটবৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল। প্রিয়তম অতিথিকে দেখিবামাত্র, পক্ষিরাজ সসম্ভ্রমে আসিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক কুশলসম্ভাষণ করিলেন, এবং পক্ষপুটে বীজন পূর্ব্বক তদীয় শ্রান্তিদূর করিলেন। অনন্তর অতিথিকে পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া, রাত্রিকালে তদীয় ব্যালভয়াদিনিবারণার্থ

চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন (১)। অতিথি, রাক্ষসরাজের নিকট প্রচুর অর্থলাভে পূর্ণকাম হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গৌতম বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে, পক্ষিরাজও বহুক্ষণ পরিচর্য্যার পর, স্বয়ং তদীয় পার্শ্বে বিশ্রব্ধচিত্তে শয়ন করিলেন।

গৌতম শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি লোভ-প্রযুক্ত অতিরিক্ত সুবর্ণভার গ্রহণ করিয়াছি। এই গুরুতর ভার বহন করিয়া আমাকে বহুদূর যাইতে হইবে। সঙ্গে আহারের সম্বল চাই। এক্ষণে আমার পার্শ্বে এই অপূর্ব্ব আহার বিদ্যমান। এই পক্ষীটাকে মারিয়া লইলেই পথে আহারের সংস্থান হইবে। কৃতঘ্ন নরপিশাচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, জ্বলন্ত কাষ্ঠের নিদারুণ আঘাতে সেই বিশ্বস্ত-চিত্তে শয়ান, মহোপকারী পক্ষিরাজের প্রাণবধ করিল। পক্ষী তাহার ব্যালভয়-নিবারণার্থে যে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, নরাধম সেই কাষ্ঠের আঘাতেই সেই প্রাণদাতার প্রাণ সংহার করিল। যে পক্ষপুটের সুস্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা পক্ষী তাহার সন্তাপ হরণ করিয়াছিলেন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা সে তাহা ছিন্ন করিল। পক্ষীর যে হৃদয় তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমরসে দ্রবীভূত

---

(১) ব্যালভয়'—সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর ভয়। পর্ব্বতে বা অরণ্যে রাত্রিকালে বাস করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কোনও হিংস্রজন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

হইয়াছিল, দুরাত্মা তাঁহার সেই হৃদয় শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অনন্তর তাঁহার দেহমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইল। এইরূপে আহারের সংস্থান করিয়া, সানন্দে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে, ঐ পক্ষিরাজের প্রিয়বন্ধু সেই বিরূপাক্ষনামক রাক্ষসরাজের মন অকস্মাৎ কেমন বিচলিত হইল। তিনি যেন কোনও প্রিয়তম বস্তুর শোকে অস্থির হইলেন। ভাবিলেন,—হায়! আজি আমার সেই প্রিয়মিত্র পক্ষিরাজের জন্য প্রাণ কেন আকুল হইতেছে? তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া, পরমব্রহ্মের উপাসনা সাঙ্গ করিয়া, যখন গৃহে প্রতিগমন করেন, তখন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনও যান না। আজি তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না কেন?

আমার নিকটে তিনি যে অতিথিকে পাঠাইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও, প্রকৃতিতে ঘোর পিশাচ। তাহার আকারে ও ভাবগতিকেই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। বুঝি সেই কৃতঘ্নই তাঁহার প্রাণহত্যা করিল।

রাক্ষসপতি এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, প্রিয়বন্ধুর সংবাদ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। রাক্ষসকুমার পিতার আজ্ঞায় বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিল। সে সেই বটবৃক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় পক্ষিরাজ নাই, সমস্ত অরণ্য যেন কোনও গভীর শোকে নীরব। বৃক্ষতলে কতকগুলি দগ্ধ কাষ্ঠ পতিত আছে এবং তাহার এক পার্শ্বে সেই পক্ষীর

ছিন্ন পদ ও পক্ষসকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। উহা দেখিবামাত্র সে সেই সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝিতে পারিল, এবং দুরাত্মা গৌতমকে ধৃত করিবার জন্য প্রলয়বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষসকুমার অনতিবিলম্বে গৌতমকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত করিল।

রাক্ষসেন্দ্র সেই কৃতঘ্নের নিকটে প্রিয়বন্ধুর দেহমাংস দর্শন করিয়া, মহাশোকে গভীর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসনগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি শোকে ও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাক্ষসগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই দণ্ডেই এই দুরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহার দেহ ভক্ষণ কর।

রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড হইল বটে, কিন্তু রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমরা প্রাণান্তেও এই কৃতঘ্নের দেহ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অনন্তর, তিনি তাহার দেহমাংস দস্যুগণকে প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দস্যুরাও সেই পাপিষ্ঠের মাংস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তিনি মাংসলোলুপ শ্বাপদগণকে সেই মাংস বণ্টন করিয়া দেওয়াইলেন। শ্বাপদেরাও সেই কৃতঘ্নের মাংস ঘৃণায় পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তাহা কৃমিকীটগণকে প্রদত্ত হইল। নরকের কৃমিকীটেরাও সেই কৃতঘ্নের দেহ স্পর্শ করিল না (১)।

---

(১) "ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্! কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

অতঃপর, রাক্ষসরাজ প্রিয় সুহৃদের অক্ষয়স্বর্গকামনায় সপরিবার মিলিত হইয়া, তদীয় অগ্নিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার পক্ষ, পদ ও মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু দেহাবশেষ পাইলেন, সমস্ত চিতামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। রাক্ষসপতির শোকাগ্নির সহিত সেই চিতাগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইল। বিশ্বনাথের অভাবনীয় ঘটনাচক্রের গতি কে বুঝিতে পারে ? ঠিক্ সেই সময়ে দেবমাতা, ভগবতী, কামধেনু সুরভি ঊর্দ্ধপথে গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সুরভির বদন হইতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা স্খলিত হইয়া সেই চিতামধ্যে পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে চিতানলের মধ্য হইতে সেই দিব্যস্বভাব পক্ষী অক্ষত শরীরে বহির্গত হইলেন। সেই ঘোর শ্মশান তৎক্ষণাৎ উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। বন্ধুকে পুনর্জীবিত দেখিয়া রাক্ষসেন্দ্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানে

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ নৃশংসশ্চ নরাধমঃ।

ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভিশ্চান্যৈর্ন ভুজ্যন্তে হি তাদৃশাঃ" ॥

(মহাভারত, আপদ্ধর্ম, ১৭২ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যাকারীরও নিষ্কৃতি আছে, সুরাপায়ীরও নিস্তার আছে, চোরেরও পরিত্রাণ আছে, যে ব্যক্তি ব্রত হইতে স্খলিত হয় তাহারও উদ্ধার আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের পরিত্রাণ নাই।

মিত্রদ্রোহী, নৃশংস, নরাধম, কৃতঘ্ন পাপীর দেহ শ্বাপদেরাও ভোজন করে না, কৃমিকীটেও তাহা স্পর্শ করে না।

আবির্ভূত হইয়া, রাক্ষসরাজকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক, তদীয় আনন্দে পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া, পক্ষী তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রাণাধিক অতিথি গৌতমকে জীবিত করুন; তিনি জীবন পাইলেই আমার জীবনলাভ সার্থক হইবে।

দেবেন্দ্র তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, অমৃতসেচনে গৌতমকে জীবিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গৌতম দৈববলে পুনর্জীবন লাভ করিলে, পক্ষিরাজ আনন্দে বিহ্বল হইয়া, তাহাকে প্রেমভরে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। পতিতপাবন, দীনদয়াময় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয় উচ্ছলিত হইল। তিনি পুলকিতচিত্তে সেই কৃপাপীযূষসাগর জগৎপিতাকে বার বার স্তব করিলেন। যেমন নিরাকার শূন্যে কোনও রেখাই অঙ্কিত হয় না, তেমনি তাঁহার নিষ্কাম, নির্ব্বিকার ও বিশ্বপ্রেমিক হৃদয়ে, গৌতমের কৃত সেই লোমহর্ষণ পাপাচরণ বিন্দুমাত্রও বিকার উৎপাদন করিতে পারিল না। কেন না, তাদৃশ মহাত্মার ক্ষমা, দয়া ও প্রেম, সর্ব্বাবস্থায় অটল ও অবিকারী। তিনি পূর্ব্ববৎ প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে গৌতমের অতিথি-সৎকার করিয়া, তাহাকে পরম সমাদরে বিদায় দিলেন, এবং পথে তাহার কোনও কষ্ট না হয়, তাহারও উপায় বিধান করিলেন

মহাভারতে এইরূপ বহুসংখ্যক উপাখ্যান আছে। এক একটী উপাখ্যানের প্রকৃতি যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই সেই দিব্যপ্রকৃতি ভারতীয় আচার্য্যগণের প্রতি. হৃদয়ে আনির্ব্বচনীয় ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়। অহো! কি শুভক্ষণেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! লোকশিক্ষার জন্য কি মহীয়ান্ আদর্শই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! জগতে কি অমূল্য নিধিই রাখিয়া গিয়াছেন! যাহার দেহ, নরকের কৃমিকীট পর্য্যন্ত, ঘৃণায় স্পর্শ করিল না, পরমকারুণিক ভারতীয় আচার্য্যেরা সেই নরক-কীটাধম মহাপাপীকেও প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। ধন্য সেই পুণ্যশ্লোক আচার্য্যগণ! ধন্য তাঁহাদের শিক্ষা! ধন্য তাঁহাদের যোগসিদ্ধি! তাঁহারা প্রাণহন্তাকেও প্রাণমধ্যে, হৃদয়ভেদীকেও হৃদয়মধ্যে সাদরে প্রতিষ্ঠিত করেন। করুণাময় বিশ্বপতির রাজ্যে তাঁহারাই যথার্থ রাজভক্ত প্রজা।

এ সংসারে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁহারাই শিখিয়াছিলেন। যাহার প্রভাবে জীবলোক জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দধামে বিহার করে, সেই বিশ্বপ্রেম-মহামন্ত্রের তাঁহারাই উপদেষ্টা। সেই নির্ব্বিকার, যোগসিদ্ধ আচার্য্যগণের অনুশাসন এই;—

"যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম॥" (১)

---

(১) শরশয্যায় শয়ান মহাত্মা ভীষ্মের উক্তি।
(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ৩২০ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।)

—সমকালে যদি এক ব্যক্তি আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে, এবং অপর ব্যক্তি আমার বাম বাহুকে কুঠার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, ঐ উভয় ব্যক্তিই আমার সমান প্রেমাস্পদ।

এ উপদেশে কে না চমকিত হইবেন? ইহার লোমহর্ষণ কঠোরতা ও অনির্ব্বচনীয় মধুরতার কথা ভাবিলে, বিস্ময়ে ও ভক্তিভরে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যাঁহার অন্তরাত্মা বিশ্বপ্রেমে দ্রবীভূত হইয়া, সেই প্রেমময় ঈশ্বরের আদর্শে গঠিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট, প্রাণহন্তা ও প্রাণদাতা, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, মনুষ্য হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবমাত্রেই সমান আদর ও প্রীতি লাভ করে। কেন না, তিনি সর্ব্বত্রই সেই অদ্বৈত মহাপ্রেমের জাজ্বল্যমান সত্তা ও স্বরূপকে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন।

মহাভারতের কথা।

কপোত-কাহিনী।

শরণাগতপালনের অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত।

কাননে বসতি করে ব্যাধ একজন,
সারাদিন পশু, পক্ষী মারে অগণন।
বিকট-মূরতি পাপী নিঠুরহৃদয়,
"দয়া-ধর্ম্ম" তার কাছে উপকথা হয়।
দিবানিশি জীবহিংসা করে অবিরত,
প্রাণিনাশে প্রাণে তার আনন্দ সতত।
মানব তাহারে হেরি পলায়ন করে,
একাকী সে বন্ধুহীন কাননে বিহরে।

এক দিন মৃগ মারি, নিষাদ নিদয়,
ভ্রমিছে গহন বনে প্রফুল্লহৃদয়।
হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে,
কড় কড় ডাকে বাজ বিজলী বিকাশে,
গরজি বহিল ঝড় কাঁপায়ে অবনি,
মুষলধারায় বৃষ্টি আসিল তখনি।
ক্রমে ক্রমে জলস্থল সমস্ত কান্তার, (১)
জলে জলে হয়ে গেল সবি একাকার।

---

(১) "কান্তার"—অরণ্য।

নীরব বিহগ, পশু হয়ে মৃতপ্রায়,
যেখানে যে পেলে ঠাঁই রহিল তথায়।
বিষম বিপদে এবে শত্রুতা ভুলিল,
ভেক-সাপ-ছাগ-বাঘ একত্র রহিল।
অবসন্ন শ্রান্ত ব্যাধ তাহে পথহারা,
এ দুর্যোগ হেরি তার চক্ষে বহে ধারা।
কাঁপিছে দারুণ শীতে আর্দ্র কলেবর,
দাঁড়াইতে স্থান নাই আকুল অন্তর।
এমন সময়ে দেখে সম্মুখে চাইয়া,
রয়েছে কপোতী এক ভূতলে পড়িয়া।
প্রবল অসহ্য শীতে বড় যাতনায়,
বহিছে অন্তিম শ্বাস কাঁপিতেছে কায়।
আসুক সহস্র মৃত্যু কোটি দুঃখভার,
কিসে হয় পিশাচের করুণাসঞ্চার ?
পিশাচ নিষাদ তার নিকটে শমন,
তবুও ব্যথিতে হেরি গলিল না মন।
সে অনাথা বিহগীরে লইল তুলিয়া,
লোহার পিঞ্জরে শেষে রাখিল বাঁধিয়া।
ক্রমে তমোময়ী সন্ধ্যা করিল প্রবেশ,
ধরিল কানন আরো ভয়ঙ্কর বেশ।
নিরাশ্রয় নিরুপায় হইয়া নিষাদ,
ছাড়িতে লাগিল ক্রমে জীবনের সাধ।

কিন্তু নিশা-আগমনে হাসিল গগন,
আবার সোণার চাঁদ দিল দরশন।
বিধির মধুর-শান্তি-রসে ঢল ঢল—
চন্দ্রিকা ভুবনতল করিল উজ্জ্বল ;
খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ নীল নভস্তলে
ফেনরাশি ভাসে যেন নীলাম্বুধি-জলে।
নিকটে হেরিল ব্যাধ উচ্চ তরুবর,
আকাশ পরশে শাখা-প্রশাখা-নিকর।
হেরি আনন্দিত ব্যাধ ভাবে মনে মনে,—
"জলে ভরা ধরা, ঘরে যাইব কেমনে ?
এই তরুতলে আজি যামিনী যাপিব,
প্রভাতে উঠিয়া কালি আবাসে যাইব।"
ইহা ভাবি বৃক্ষতলে করিয়া গমন,
করযোড়ে বৃক্ষ প্রতি করে নিবেদন ;—
"প্রাণভয়ে ভীত আমি এসেছি হেথায়,
আজি নিশি তরুরাজ ! রাখিও আমায়।"
কপোতী-পিঞ্জর ব্যাধ পাশেতে থুইয়া,
শিলায় রাখিয়া মাথা রহিল শুইয়া।
সেই তরু কপোতীর নিবাস-ভবন,
পতি সহ সেথা কাল করিত যাপন।
আজি সারাদিন গেল আসিল রজনী,
তবু ফিরিল না ঘরে কপোত-রমণী ;

তাই তার পতি অতি শোকার্ত্ত হইয়া,
বিলাপে আকুল স্বরে ভার্য্যারে স্মরিয়া,—
"ঘোরতর ঝড়-বৃষ্টি হইল ভুবনে,
প্রিয়া ফিরিল না ঘরে, হায়! কি কারণে?
মম গৃহ শূন্য এবে যাহার লাগিয়া,
বনমাঝে বিপদে ত পড়েনি সে প্রিয়া?
গৃহ যদি পূর্ণ রয় পুত্র-পৌত্রগণে,
তবু সব শূন্য হয় ভার্য্যার বিহনে।
গৃহকে কহেনা "গৃহ" কভু সুধীজন,
'গৃহিনীই গৃহ' ইহা শাস্ত্রের বচন।
যে ঘরে গৃহিণী নাই, অরণ্য সে ঘর,
অতৃপ্তি-অশান্তি-ভরা সদা ভয়ঙ্কর।
আহা! সেই পতিপ্রাণা পতিব্রতা সতী,
প্রিয়তমা, প্রিয়ংবদা, প্রেমের মূরতি,
সে যদি না থাকে ঘরে তবে কি কারণে
এ পোড়া জীবন আমি রাখিব যতনে?
কিবা স্নান কি আহার অথবা শয়ন,
আমি না করিলে সে ত করে না কখন।
আমার আনন্দে তার আনন্দ না ধরে,
মম দুঃখে তারি হিয়া ভাঙে দুঃখ-ভরে।
না হেরিলে মোরে তার মলিন বদন,
মোর রোষে প্রিয়ভাষে তোষে অনুক্ষণ।

পতিমাত্র ব্রত তার পতি মাত্র গতি,
পতি-প্রিয়-হিত-কার্য্যে নিরন্তর মতি।
শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত আমি হই যেইক্ষণে,
তখনি তা সে সরলা বোঝে মনে মনে।
তার মত প্রিয়তমা যে জনের হয়,
সে দীন কাঙাল যদি তরুতলে রয়,
'তরুতল' নহে সে ত ভূপতি-ভবন,
সে বিনা রাজার পুরী শ্মশান ভীষণ।"
পিঞ্জরে কপোতী ছিল সেই বৃক্ষতলে,
পতি-বাক্য শুনি ভাসে আনন্দাশ্রুজলে।
মনে ভাবে,—"মম সমা সুভগা কোথায় ?—
এত স্নেহময় পতি কার এ ধরায় ?
সুভার্য্যার গুণ থা'ক্ নাই থা'ক্ মম,
তবু মোরে হেন প্রীত পতি প্রিয়তম।
পতি পরিতুষ্ট হন যে নারীর প্রতি,
তাহারেই তুষ্ট হন জগতের পতি।"
এই সব মনে মনে চিন্তিয়া তখন,
পতি প্রতি করে সতী প্রিয় সম্ভাষণ।
কহিলা সে—"হেথা আমি আছি প্রিয়তম !
একটী মিনতি আজি শুন তুমি মম ;
তোমার শরণাগত এই ব্যাধ জন,
আজি এরে প্রাণপণে করহ রক্ষণ।

নিরুপায়, নিরাশ্রয়, বিপদ-সময়
তোমার আবাস-বৃক্ষে লয়েছে আশ্রয়।
শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, প্রাণ যেতেছে ইহার,
যাহা পার কর নাথ! অতিথি-সৎকার।
যে জন শরণাগত, তাহার রক্ষণ—
গৃহীর সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, শাস্ত্রের বচন।
প্রাণপণে যেই জন সেই ধর্ম্ম পালে,
সে অক্ষয় ব্রহ্মলোক পায় পরকালে।
অতএব নিজ গৃহ, ধন, পরিজন,
দেহের মমতা ছাড়ি সঁপিয়া জীবন
শরণাগতের সেবা কর এইক্ষণে,
এ দাসীর তরে দুঃখ না করিও মনে।"

শুনিয়া পত্নীর মুখে মধুর ভারতী,
পুলকে শিহরি উঠে কপোতীর পতি:
বহিল প্রেমাশ্রুধারা নয়নযুগলে,
কৃতাঞ্জলিপুটে গিয়া নিষাদেরে বলে;—
"দয়া করি মহাশয়! আজ্ঞা কর তবে,
তব প্রিয় কার্য্য মোর কি করিতে হ'বে?
ভেব না পরের বাড়ী, কিম্বা কেহ পর,
তোমারি সকল এথা, তোমারি এ ঘর।
পরম শত্রুও যদি আসে কারো ঘরে,
অতিথি-সৎকার তার করিবে আদরে;

কাঠুরিয়া বৃক্ষতলে আসিয়া যখন,
বৃক্ষের জীবনী মূল করয়ে ছেদন,
তখনো তাহারে তরু তোষে ছায়াদানে,
প্রতিশোধ নাহি কভু অতিথির স্থানে।
যথাবিধি অতিথিরে না সেবে যে জন,
ইহ পরলোক তার না থাকে কখন।
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে যে দুর্গতি,
তার প্রতি সদা প্রীত জগতের পতি।
গৃহীর প্রধান যজ্ঞ অতিথি-সেবনে,
তাই বলি কৃপা কর এই অভাজনে।"
কপোতের কথা শুনি কহিল নিষাদ,—
"শীতে আমি মৃতপ্রায়, মরমে বিষাদ।
তোমার নিকটে মোর এই নিবেদন,
আগুন জ্বালিয়া কর শীত-নিবারণ।"
শুনিয়া ব্যাধের কথা কপোত নিপুণ,
যতনে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল আগুন।
লাগিল অগ্নির তাপ নিষাদের গা'য়,
মৃত দেহে প্রাণ তার এল পুনরায়।
আবার কহিলা ব্যাধ,—"শুন খগবর!
আমি হইয়াছি বড় ক্ষুধায় কাতর;
কিঞ্চিৎ আহার যদি কর মোরে দান,
তবে এ রজনী মম রক্ষা হয় প্রাণ।"

শুনিয়া কপোত ভাবে দুঃখিত অন্তরে,
"অতিথি ক্ষুধিত আজি, খাদ্য নাই ঘরে।
হেন কালে মনে হ'ল ভার্য্যার বচন,
"প্রাণ দিয়া অতিথিরে করিবে সেবন।"
সে অমূল্য উপদেশ ভাবিতে ভাবিতে,
ব্যাধেরে প্রফুল্ল মুখে লাগিল কহিতে,—
"ক্ষুধিত অতিথি আজি তুমি মম ঠাঁই,
ক্ষুধা শান্তি করি, হেন কিছু আজি নাই;
ক্ষুদ্র এক দেহ মোর, তাই শুধু আছে,
সেই দেহ দান আমি করি তব কাছে।
যে অনলে হ'ল তব শীত নিবারণ,
সে অনলে মম দেহ পোড়াব এখন।
মোর সেই দগ্ধ দেহ করিয়া আহার,
পরিতৃপ্তি হয় যদি মুহূর্ত্ত তোমার,
তাহা হ'লে অভাগার হইবে সদগতি,
দেবতা প্রসন্ন হ'বে এ দাসের প্রতি।"
এই কথা বলি, পক্ষী হাসিয়া হাসিয়া,
জ্বলন্ত অনলে পড়ি, গেলেন পুড়িয়া।

মরতে পরশ-মণি হয় সাধুজন,
সাধু-সঙ্গে পায় পাপী নবীন জীবন।
কপোতের দেবভাব করি' দরশন,
গলি গেল নিষাদের বজ্রসম মন।

"ধর্ম্ম" নাম আজি পাপী প্রথম জানিল,
মরিয়া কপোত তারে নব প্রাণ দিল।
অনুতাপে পূর্ণ ব্যাধ শোকার্ত্ত হইয়া,
ছাড়ি দিল কপোতীরে পিঞ্জর খুলিয়া।
সে অবধি পাপ কাজ নিষাদ ছাড়িল,
সমস্ত জীবন ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিয়োজিল।

এদিকে কপোত-বধূ মুক্তি লাভ করি,
পুত্র-কন্যা-পরিজন-মায়া পরিহরি,
যে অনলে পতি তার মরেছে পুড়িয়া,
সেই কালানলে দিল শরীর ঢালিয়া।

মহাভারতের কথা।

উঞ্ছবৃত্তি পরিবারের দানধর্ম্ম।
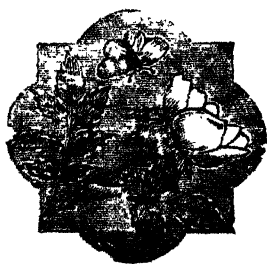
অত্যাশ্চর্য্য আতিথেয়তা।

পুরাকালে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণ বাস করিতেন। তথায় উঞ্ছবৃত্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা, একটী পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। সেই ব্রাহ্মণপরিবার সংযতাত্মা, ধর্ম্মশীল, সত্যনিষ্ঠ ও আতিথেয়। তাঁহারা প্রতিদিন পরমভক্তিযোগে নিয়মিত ধর্ম্মকর্ম্মসকল সম্পাদন করিতেন, এবং উঞ্ছবৃত্তি (১) দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, তদ্দারা সকলে প্রাণধারণ করিতেন।

একদা ঘোর অনাবৃষ্টিবশতঃ দেশের শাক, শস্য, কন্দ-মূল-ফলাদি নিঃশেষ হইল। বহু আয়াসেও আর খাদ্য মিলে না। ঐ ব্রাহ্মণপরিবার উপর্য্যুপরি অনাহারে থাকিয়াও, ব্রত-হোম-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

---

(১) কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে ধান্য-গোধূমাদি কাটিয়া লইয়া গেলে, তথায় ইতস্ততঃ গর্ত্তাদিমধ্যে যে সকল শস্য পতিত থাকে, যাহা পশু-পক্ষীরাও লইতে পাবে না, তাহা খুঁটিয়া সংগ্রহ করাকে 'উঞ্ছবৃত্তি' বা 'উঞ্ছজীবিকা' বলে। যে ব্যক্তি এইরূপে জীবন ধারণ করে, তাহাকেও 'উঞ্ছবৃত্তি' বলা যায়। ধর্ম্মশীল তাপসগণের কাহারও জীবিকার ব্যাঘাত করিতে নাই।

অনশনে ক্রমে তাঁহারা কঙ্কালসার হইলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইল। একদা তাঁহারা নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ও বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে এক প্রস্থ যব (১) সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা পরমযত্নে সেই যবগুলি ভাঙ্গিয়া শক্তু প্রস্তুত করিলেন। তদ্দারা যথাবিধি বলিকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া, সকলে তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন। সে মুমূর্ষু অবস্থায়, সেই এক এক মুষ্টি শক্তু তাঁহাদের প্রাণপ্রদ অমৃত বলিয়া জ্ঞান হইল। তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে বসিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথিদর্শনমাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে আহার রাখিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি দানে ও কুশলপ্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়া, ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—মহাশয়! আজি আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, যে, আপনি কৃপা করিয়া এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিতেছি। এই শক্তু আমাদের বিশুদ্ধভাবে উপার্জ্জিত। এই ধর্ম্মলব্ধ যৎসামান্য ভক্ষ্য আমি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে (২) আপনাকে দিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া

(১) 'প্রস্থ'—চারি কুড়ব।

(২) অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় দান কবিতে নাই। তাহা করিলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দাতা নিজেই ক্লিষ্ট হয়।

"অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্মৈচিল্লীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ॥"
(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৩শ সর্গ, ৩৪ শ্লোক।)

ইহা ভোজন করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। অতিথি তাহা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষুধা-শান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,—এক্ষণে কি উপায়ে ইহাঁর তৃপ্তিসাধন করি। অতিথি অতৃপ্ত হইলে, আমার সকল সাধনাই নিষ্ফল হইবে। প্রাণ দিয়াও অতিথিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। পতিকে বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন,—নাথ! আমার এই শক্তুভাগ লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। ইনি তৃপ্ত হইয়া গমন করুন। সর্ব্বাগ্রে অতিথির তৃপ্তিসাধন করা আমাদের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। সেই অনশন-মুমূর্ষু সাধ্বীর ঐ কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। অনশন-যন্ত্রণা কিরূপ, তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতেছিলেন। সে অবস্থায়, সেই ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, অস্থিচর্ম্মাবশেষা, অনশন-যাতনায় কম্পমানা, বৃদ্ধা, পতিপ্রাণা পত্নীর মুখের গ্রাস তিনি কোন্ প্রাণে হরণ করেন? তিনি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ও কথা আর মুখেও আনিও না। দেখ! পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গেরাও প্রাণপণ যত্নে তাহাদের স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করে। তির্য্যগ্‌যোনিরও স্ত্রীজাতি মানবের অবধ্যা (১)। আমি জ্ঞানী মনুষ্য হইয়া, আমার চক্ষের উপর, পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর অনশনমৃত্যু দর্শন করিব? প্রিয়ে! তুমি আমার

(১) "অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতামপি"

(ইতি স্মৃতিঃ)

জীবনের মূলবন্ধন, তোমার কল্যাণেই আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ। তোমার সহায়তা না পাইলে, সাধ্য কি, আমি ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারি। মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ চতুর্বর্গের সহায় ভার্য্যা। শুশ্রূষা, বংশস্থিতি, আত্মার ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন প্রভৃতি ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যই ভার্য্যার উপর নির্ভর করে। রোগে ও শোকে দহ্যমান মানবের একমাত্র আশ্রয় ও আরামস্থল তাহার ভার্য্যা। আতপতাপিতের পক্ষে যেমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, রোগার্ত্তের পক্ষে যেমন মহৌষধ, মুমূর্ষুর পক্ষে যেমন সঞ্জীবনী সুধা, দুঃখদগ্ধ মানবের পক্ষে তেমনি প্রিয়ংবদা, হিতৈষিণী ভার্য্যা। যে ব্যক্তি ভার্য্যারক্ষণে অক্ষম হয়, তাহার ইহলোকে ঘোর অকীর্ত্তি ও পরলোকে দুস্তর নরক। ফলতঃ তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই। অতএব তুমি এমন কথা আর মুখেও আনিও না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! এ দাসীর প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন, আমার শক্তু লইয়া অতিথিকে তৃপ্ত করুন। পতিসেবায় দেহ ও আত্মার সমাধানই নারীর রতি ও প্রীতি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ, ভুক্তি ও মুক্তি। আপনি পালনকর্ত্তা, এজন্য আমার পতি। সর্ব্বশোকহারী পুত্রমুখ আপনার প্রসাদে দর্শন করিয়াছি, এজন্য আপনি আমার বরদাতা। বিশেষতঃ উপবাসে ও পরিশ্রমে আপনি মরণাপন্ন। পতির এ অবস্থা সম্মুখে দেখিয়া, আমি নিজ মুখে অন্নজল দিব? এ কথা মনে আনিলেও আমার মহাপাপ।

পত্নীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহার শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতৃপ্ত দেখিয়া, পুনরায় বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—পিতঃ! আপনি চিন্তা করিবেন না। আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন। ইহা আমার পরম ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জানিয়াই এ কথা বলিতেছি। আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আমার পরিপাল্য। বৃদ্ধ পিতা-মাতার পরিপালন পুত্রের সর্ব্বোত্তম ব্রত এবং তাহা সর্ব্বান্তঃ-করণে আমার কাঙ্ক্ষণীয়। যে পুত্র এ সর্ব্বলোকসম্মত, সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়, তাহার নরকেও স্থান নাই। ভগবন্! আপনার লোকপাবন, পুণ্যময় জীবন অনর্ঘ্য। এ অনর্ঘ্য জীবন রক্ষার জন্য, মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করা অতি তুচ্ছ কথা। অতএব আর ইহাতে দ্বিধা করিবেন না। আমি ইহা পুলকিত চিত্তে দান করিতেছি।

পিতা কহিলেন,—পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা পুন্নাম নরক(১) হইতে ত্রাণ পায়। পুত্রই পিতা-মাতার কৃতি, কীর্ত্তি ও কুল-স্থিতির রক্ষার নিদান। পুত্র শত বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও, সে তাহার পিতা-মাতার নিকট শিশু। তুমি ত অল্পবয়স্ক। এ বয়সে তোমাদের ক্ষুধাই বলবতী। আমার এ বৃদ্ধবয়সে

(১) "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

ক্ষুধার যাতনা বোধ হয় না। আমি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছি। এক্ষণে মরণে আমার দুঃখ নাই। হে বৎস! তুমি আমার দেহের ও হৃদয়ের সার-সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার আত্মা। প্রাণধন! তুমি চিরজীবী হও। যে পিতা পুত্রকে ধার্ম্মিক ও নিরাময় দেখিয়া মরিতে পারে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে? আমি ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

পুত্র, স্নেহময় পিতৃদেবের সেই কথা শুনিয়া কাতরভাবে পিতৃচরণে প্রণত হইয়া, গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন,-- পিতঃ! যে পুত্র পিতা-মাতার অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা না করে, পিতা-মাতার মঙ্গলের জন্য যে পুত্র অম্লানমুখে প্রাণ দিতে না পারে, তাহার জন্মধারণে কি ফল? সে পুত্র থাকা অপেক্ষা নারীর বন্ধ্যা হওয়া ভাল। পিতৃমাতৃকার্য্যই পুত্রের প্রাণ, পিতৃমাতৃসেবাই পুত্রের পুত্রত্ব। পিতামাতাই পুত্রের ধর্ম্ম, পিতা-মাতাই স্বর্গ, পিতামাতাই পুত্রের পরম তপস্যা। সমস্ত দেব-পূজার ও ধর্ম্মসাধনার ফল, পিতৃমাতৃভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। কুল ও ধর্ম্ম হইতে পিতার পতনকে নিবারণ করে বলিয়া, পুত্রের নাম 'অপত্য।' আমি এ সঙ্কটে যদি আপনাকে রক্ষা না করি, তবে পিতঃ! আমার জন্মগ্রহণে ধিক্!

পিতা বলিলেন,—বৎস! দেখিতেছি, রূপে ও শীলে তুমি এ বংশের যোগ্য সন্তান। আমি তোমাকে নানারূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তোমার শক্তু গ্রহণ করিব। তুমি ইহা

বিশুদ্ধ ভক্তিভাবেই দিতেছ। ইহা বলিয়া, তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে সেই শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সে অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। অতিথিকে অতৃপ্ত জানিয়া ব্রাহ্মণ বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন, এবং নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্নেহপ্রতিমা পুত্র-বধূ নিজের শক্তুগুলি লইয়া প্রফুল্লমুখে শ্বশুরকে কহিলেন, —পিতঃ! আপনারা কুশলে থাকিলেই আমার সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। আপনাদের কৃপায় আমার অক্ষয় সুরলোকে গতি হইবে। আপনাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। অতএব কৃপা করিয়া আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন।

উপবাসমুমূর্ষু পুত্রবধূর কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ সাশ্রুলোচনে বলিলেন,—সতি! লক্ষ্মি! মা আমার! নিরন্তর বাত, বর্ষা ও আতপাদি সহ্য করিয়া, তোমার দেহ বিবর্ণ ও বিশীর্ণ, তদুপরি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদিসাধনায় ও কঠোর উপবাসক্লেশে তুমি মা! অস্থিসার হইয়াছ। তোমাতে আর জীবিতের আকার নাই। তোমার দিকে চাহিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমি ধর্ম্মঘাতী হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কিরূপে তোমার মুখের গ্রাস হরণ করি? হে কল্যাণি! তুমি এমন কথা বলিও না। আমার সমক্ষে তুমি মা! অনাহারে মরিবে, আমি দেখিব? তুমি বালিকা ও ক্ষুধার্ত্তা, কঠোর পরিশ্রমে ও দীর্ঘকাল উপবাসে তোমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। আমার প্রাণ দিয়াও

তোমার প্রাণ রক্ষা করা উচিত। তুমি যে মা! আমাদের আনন্দময়ী-কুললক্ষ্মী।

পুত্রবধূ কহিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা (১), আমার দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সকলি আপনাদের সেবার জন্য। হে দেব! আপনাদের প্রসাদে আমার শুভলোকে গতি হইবে। হে পিতঃ! আপনাদের চরণে আমার দৃঢ়ভক্তি জানিয়া, আমাকে আপনাদের নিতান্ত আপনার জানিয়া আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। শ্বশুর কহিলেন,—অয়ি বৎসে! তোমার এ শীলসৌন্দর্য্য কি মধুর! ধর্ম্মব্রতে তোমার কি অচলা ভক্তি! অতুলনীয় তোমার গুরুভক্তি! তুমি ধার্ম্মিকা রমণীর শিরোমণি। তোমার একান্ত ভক্তি ও আগ্রহ জানিয়া আমি তোমার মনোরথ ভগ্ন করিব না। ইহা বলিয়া তিনি বধূর হস্ত হইতে শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। তখন অতিথি সেই সাধুবরের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি প্রীতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্ম, নররূপে তোমাদের ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমরা জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তাহাতে আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। ঐ দেখ! স্বর্গ হইতে তোমাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতেছে। অমরধামে তোমাদের এ পুণ্য বিঘোষিত হইতেছে। দেবতারা ও দেবর্ষিগণ

(১) 'গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা'—আমার পরম গুরু পতির আপনি গুরু, এবং আমার আরাধ্য দেবতা পতির আপনি দেবতা।

তোমাদের দর্শন কামনা করিতেছেন। পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ তুমি নিত্যানন্দধামে গমন কর। ব্রহ্মচর্য্যে, তপস্যায়, যজ্ঞে, দানে ও অকপট ধর্ম্মশীলতায় তোমরা স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা এমনি ভয়ানক বস্তু, যে ইহাতে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও বিবেক, সকলি বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাভিভূত ব্যক্তির প্রাণবায়ু দুঃসহ যাতনায় বহির্গত হয়। এই দুঃসহদুঃখদায়িনী, প্রাণহারিণী ক্ষুধাকে ধর্ম্মানুরোধে যে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ সাধু কে আছে? দেখ! তুমি আপনার ও প্রাণাধিক পুত্র, কলত্র প্রভৃতিরও প্রাণের মায়া না করিয়া, ধর্ম্মকেই সার বস্তু জ্ঞান করিয়াছ। শ্রদ্ধাপূত, নিঃস্বার্থ দান অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম কি আছে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি স্বর্গপথের কণ্টকস্বরূপ। যাহারা ঐ সকল রিপুকে জয় করিয়া, যতদূর শক্তি দান করে, সনাতন স্বর্গলোকের তাহারাই অধিকারী। তুমি একটী কপর্দ্দক দান কর, বা কোটি স্বর্ণ দান কর, তুমি রাশি রাশি দিব্য মিষ্টান্ন দান কর, বা তণ্ডুলকণা দান কর, তুমি সুধাভাণ্ড দান কর, বা জলবিন্দু দান কর, যদি সে দান, তোমার যতদূর শক্তি, তদনুরূপ হয়, যদি সে দান তোমার হৃদয়ের সুপবিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত হয়, তবে সে সকলি তুল্যমূল্য। তোমাদের এ শক্তু দানের নিকট কোটি কোটি অশ্বমেধ ও রাজসূয় পরাভূত। অতএব তোমরা শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়া সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ কর।

উঞ্ছবৃত্তি-কথার পরিশিষ্ট।

মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তি-পরিবারের কথা আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌম-পদে অভিষিক্ত হইয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল,—এরূপ মহাযজ্ঞ, এরূপ মহাদানপুণ্য আর কোথাও কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের জয়শব্দে সকল দেশ পূর্ণ হইল। তদীয় মস্তকে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হস্তিনার রাজসভায় সেই জয়ধ্বনি ও জনকল্লোল ভেদ করিয়া, অকস্মাৎ এক মহাকায় অদ্ভুতমূর্ত্তি নকুল উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-ভাষায় কহিল,—তোমরা যুধিষ্ঠিরের এ অশ্বমেধের এত প্রশংসাবাদ কেন করিতেছ? কুরুক্ষেত্রে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তু-দানের সহিত এ যজ্ঞের তুলনাই হয় না। নকুলের সেই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া, আগ্রহসহকারে নকুলকে উঞ্ছবৃত্তির কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। এ প্রসঙ্গে এস্থলে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি;—

এই বঙ্গদেশের কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। গৃহে একমাত্র তাঁহার বৃদ্ধা জননী। বৃদ্ধা ভিক্ষা দ্বারা অতিকষ্টে পুত্রকে পালন করিতেন। সে গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী ছিল না। দূরবর্ত্তিনী নদী

হইতে অতি কষ্টে সকলকে পানীয় সংগ্রহ করিতে হইত। সে নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হইত। তখন স্থানীয় লোকের জলকষ্টের সীমা থাকিত না। অগত্যা সকলকে সেই নদীর পঙ্কিল জল পান করিতে হইত। সেই ব্রাহ্মণের মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা বলিতেন,—বাবা! এ দুঃখিনী ত তোমাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না। তথাপি, যদি কখনও কোনও উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে পার, এ গ্রামে একটা পুষ্করিণী কাটাইও। তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা। আমি অনাহারে মরিলে, ও তুমি আমার শ্রাদ্ধ করিতে না পারিলে, আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তুমি এ কার্য্য করিলে, আমার জীবনের সকল কামনা পূর্ণ হইবে, আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে।

সেই মাতৃবাক্য ব্রাহ্মণের ধ্যান, জ্ঞান ও জপমালা ছিল। অনন্তর মাতার পরলোকগমনে, মাতৃদায়ে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইলেন। গৃহে কপর্দ্দক নাই। একখানি ভগ্ন কুটীর, কয়েকটা পুরাণ বাসন ও কয়েকখানি জীর্ণ বস্ত্র ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না। ব্রাহ্মণ সে সমস্তই বিক্রয় করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। কেবল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া, দুইখানি কোদাল ও কয়েকটা ঝুড়ি ক্রয় করিলেন। তদ্দারা তিনি নিজ বাস্তুভূমিতে স্বহস্তে পুষ্করিণী খনন করিতে লাগিলেন। অন্নাভাবে অনেক সময় তাঁহাকে উপবাস করিতে হইত এবং গৃহাভাবে যত্র তত্র শয়ন করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার কোনও কষ্টেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অহোরাত্র

অবিশ্রান্ত একান্তভাবে মাতৃনিদেশপালনেই নিযুক্ত। ক্রমে অনাহারে ও অতিশ্রমে তিনি কঙ্কালসার হইলেন। লোকেরা তাঁহাকে "ক্ষেপা বামন" বলিয়া উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ অবশেষে বুঝিলেন,—কোনও ধনীর সাহায্য বিনা, একাকী তাঁহার দ্বারা একটী বৃহৎ জলাশয় হওয়া অসম্ভব। এ কার্য্যের জন্য তিনি অনেকের নিকট ভিক্ষার্থী হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার করুণাপূর্ণ প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিল না। কোনও ধনীর গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে, তাঁহার সেই মলিন, সুজীর্ণ বেশ ও বিশীর্ণ আকার দেখিয়া, দ্বারপালেরা তাঁহাকে গলহস্ত দান করিত। তথাপি ব্রাহ্মণ অক্ষুব্ধ ও নিজ সঙ্কল্প হইতে অবিচলিত।

একদা তিনি শুনিলেন,—কলিকাতা পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১) মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রভূত দান করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। তখন উক্ত ভবনে শ্রাদ্ধ ও দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। দেওয়ানের কর্ম্মচারী ও তোষামোদকারীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া সহস্রমুখে তদীয় দানকীর্ত্তি উদ্‌ঘোষণ করিতেছিল। তথায় তাদৃশ কৌপীনধারীর প্রবেশ অসাধ্য। বহুচেষ্টায় একদিন তিনি সুযোগক্রমে দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

---

(১) ভারত-গভর্ণর হেষ্টিংসের সময়ে, ভূমি ও রাজস্বের বন্দোবস্ত-কার্য্যে ইনি গভর্ণমেন্টের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন

দেখিলেন,—বিষম জনতা। সকলেই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তদীয় দানকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ব্রাহ্মণ অকুতোভয়ে কহিলেন, ইনি এমন কি কার্য্য করিয়াছেন, যে আপনারা ইহাঁকে এত বাড়াইতেছেন? ইহাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ, কোনও ক্রমেই আমার মাতৃশ্রাদ্ধের তুল্য নহে। ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া, সকলেই ব্রাহ্মণের উপর রুষ্ট হইল এবং তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেহ কেহ তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সদাশয়, গঙ্গাগোবিন্দ সকলকে তিরস্কার পূর্ব্বক, সাদরে ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং বিনয়মধুর বাক্যে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক, সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দান করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন্! আপনি আপনার বহুলক্ষ টাকা আয় হইতে কয়েক লক্ষমাত্র মাতৃশ্রাদ্ধে দান করিয়াছেন। আপনার বিশাল জমিদারি, অট্টালিকা, গৃহসজ্জা এবং দাস, দাসী প্রভৃতি সকলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিছুরই অভাব দেখিতেছি না। কিন্তু আমার "নান্নং ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রম্।" আমি ঈশ্বরী মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধে সকলি দান করিয়াছি, একটী মৃৎপাত্রও অবশিষ্ট নাই। গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইয়া, তাঁহার বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সাশ্রুনয়নে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের কথিত ঘটনা সত্য কি না জানিবার জন্য, সে স্থানে নিজ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন, এবং তাহার নিকট

ব্রাহ্মণের বিবরণ সত্য জানিয়া, অচিরে সেই গ্রামে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন. এবং তাহা সেই ব্রাহ্মণের মাতার নামে উৎসর্গ করিলেন

মহাভারতের কথা।

—ঃ()ঃ—

চিরকারীর উপাখ্যান।

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।"

পূর্ব্বকালে গৌতমবংশীয়, মহাতপা মেধাতিথিনামক মহর্ষির চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন। একদা মহর্ষি কোনও কারণে পত্নীর উপর ক্রোধান্ধ হইয়া, পুত্র চিরকারীকে আদেশ করিলেন,—তুমি স্বহস্তে তোমার মাতার শিরশ্ছেদন কর। পুত্রকে এই আদেশ করিয়া ও তদীয়হস্তে শাণিত কৃপাণ প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই, পরশুরামের ন্যায়, জননীর শির-শ্ছেদন না করিয়া, কৃপাণহস্তে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি কিরূপে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, কিরূপেই বা মাতৃহত্যা-পাতকে নিমগ্ন হই? একদিকে যেমন পিতার আজ্ঞাপালন

পরম ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি মাতৃহত্যা মহাপাপ। স্ত্রীহত্যা করিয়া, বিশেষতঃ মাতৃহত্যা করিয়া, এ জগতে কে সুখী হইতে পারে ? পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াই বা কে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে ? আমার অস্তিত্ব পিতা-মাতা হইতেই। শীল, চরিত্র ও কুলের রক্ষণার্থেই পিতা জায়াগর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। সন্তানকে দেহ প্রভৃতি যাহা কিছু দিবার পিতা সকলি প্রদান করেন। পিতাই পুত্রের রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও জ্ঞানদাতা। পিতাই পরম গুরু ও পরম ধর্ম্ম। জাতকর্ম্মের সময় পিতা এই বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন ;—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদাং শতম্।"

—হে পুত্র ! তুমি আমার প্রতি অঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে নির্গলিত হইয়াছ, তুমি পুত্র-নামধারী আমারি আত্মা, তুমি চিরজীবী হও।

পুত্র পিতার প্রীতিস্বরূপ, এবং পিতা পুত্রের সর্ব্বাচ্ছাদক। পিতার আজ্ঞাপালন করিলে, পুত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। বন্ধন হইতে পুষ্প চ্যুত হয়, বৃক্ষ হইতে ফল ভ্রষ্ট হয়, কিন্তু পুত্র কিছুতেই পিতার স্নেহবন্ধন হইতে চ্যুত হয় না। পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, পিতার প্রীতিতেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। অতএব কোনও বিচার না করিয়াই সেই পরম গুরুর আজ্ঞা পালনীয়।

চিরকারী এই পর্য্যন্ত ভাবিয়াই পিতার আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন না। কেন না তিনি চিরকারী। ধীরভাবে কোনও বিষয়ের দুই দিক্ ভাবিয়া যিনি কার্য্য করেন, যিনি পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ বিচার না করিয়া সহসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, তাঁহাকেই চিরকারী বলে। তিনি যেমন পিতৃপক্ষ ভাবিলেন, তেমনি মাতৃপক্ষও এইরূপে ভাবিতে লাগিলেন ;—অরণি যেমন অগ্নির উৎপত্তিস্থান (১), মাতাও তেমনি সন্তানের পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডের প্রসবভূমি। মাতাই সন্তানের সর্ব্বদুঃখের শান্তি। মাতাই লোকের আশ্রয়, মাতা না থাকিলে লোক নিরাশ্রয় হয়। যাহার মাতা আছেন, তাহার শোক কি ? যাহার মাতা আছেন, সে বৃদ্ধ হইলেও যুবা, অকিঞ্চন হইলেও ভাগ্যধর। যাহার জননীরূপ আশ্রয় বর্ত্তমান আছে, সে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ হইয়াও, দুই বৎসরের শিশুর ন্যায় সদানন্দে বিহার করে। সন্তান সমর্থ হউন, বা অসমর্থ হউন ; ক্ষীণ হউন, বা পুষ্ট হউন, মাতা সকল অবস্থায় সমভাবে তাহাকে পালন করিয়া থাকেন ; মাতার পালন আর কেহই জানেন না, মাতৃস্নেহ আর কোথাও পাওয়া যায় না। যখন লোকের মাতৃবিয়োগ হয়, তখনি সে জরাজীর্ণ হয়, তখনি সে দীনহীন হয়, তখনি তাহার নিকট জগৎ শূন্যময় হয়। মাতার ন্যায় আশ্রয় আর নাই, মাতার ন্যায় রক্ষা আর নাই, মাতার ন্যায় প্রাণারাম প্রিয়পদার্থ আর নাই, মাতার ন্যায় সন্তাপহারিণী

(১) 'অরণি'—অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়

ছায়া (১) আর নাই। একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেই সন্তানের সর্ব্বযাতনা নির্ব্বাণ হয়। অহো! মা-নামের কি মোহিনী শক্তি! সুধাময় মা-নাম, মানবের প্রতি ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী করুণা!

মাতাই পিতা এবং মাতাই মাতা, অর্থাৎ মাতাই পিতা-মাতার সমষ্টি। মাতা সন্তান পালন করেন বলিয়াই পিতা প্রীতি, স্নেহ ও পুত্র-সৌভাগ্য উপভোগ করেন। পিতা দেবলোকের সমষ্টি, কিন্তু মাতা দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোকের সমষ্টি। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমের ন্যায় একাধারে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য মাতাতেই বিদ্যমান।

চিরকারী এইরূপে তন্ময়ভাবে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বররূপিণী জননীর অগাধ ও অসীম করুণার বিষয় ধ্যান করিতে করিতে মহাভক্তিযোগে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার হস্তের কৃপাণ হস্তেই রহিল। বহুদিন গত হইল, তথাপি তাঁহার সে যোগ ভগ্ন হইল না। অনাহার, অনিদ্রা কিছুরই উদ্বোধ রহিল না। চিরকারীর পিতা সেইরূপ আজ্ঞা করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে গৃহাভিমুখে প্রতি-

(১) "নাস্তি মাতৃসমা ছায়া"—মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই, আহা কি মিষ্ট কথা! যাঁহার বরাঙ্গস্পর্শে সদ্য সর্ব্বসন্তাপ নির্ব্বাণ হয়, যাঁহার অমৃতময় নাম করিলেই আধি-ব্যাধি দূরে যায়, সেই "সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী" জননীর ন্যায় শান্তিময়ী ছায়া এ জগতে আর কি আছে?

নিবৃত্ত হইলেন। তিনি কঠোর অনুতাপে দহ্যমান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—পুত্র অবশ্যই আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছে, আমি গৃহে গিয়া আমার সেই প্রাণপ্রতিমা গৃহলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইব না। হায়! সতী-হত্যা করিয়া আমি দুস্তর নরকসাগরে নিমগ্ন হইলাম! আমাকে কে উদ্ধার করিবে? পশুপক্ষীরাও স্ত্রীজাতিকে অবধ্য জ্ঞান করে। হা বৎস! চিরকারিন্! তুমি কি সত্যসত্যই মাতৃহত্যা করিয়াছ? তুমি যদি পিতার এরূপ আজ্ঞা পালন না করিয়া থাক, তবে জানিব তুমি যথার্থই চিরকারী। যিনি তোমার কতই কল্যাণ কামনা করিয়াছেন, যিনি তোমার জন্য কতই গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, যিনি তোমার পালনের জন্য শবসাধনা করিয়াছেন, তুমি যদি ঈশ্বরের করুণারূপিণী সেই জননীকে রক্ষা করিয়া থাক, তবেই মাতৃরক্ষা পিতৃরক্ষা, আত্মরক্ষা ও আমার চিরকালোপার্জ্জিত তপস্যা রক্ষা করিয়াছ। মহর্ষি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের ন্যায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুত্র কৃপাণহস্তে যোগমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার দুই কপোল বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। পিতার আহ্বানে পুত্রের যোগভঙ্গ হইল। তিনি পিতাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র চমকিত হইলেন, এবং শস্ত্রত্যাগ করিয়া, নিতান্ত কাতরভাবে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

চিরকারীর মাতা দূর হইতে পতিকে দর্শন করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় বেগে আসিয়া, পতির চরণে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন মহর্ষি পত্নীকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি যথার্থই পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়াছ, তুমি যথার্থই পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ। তুমি পিতার আজ্ঞায় যে আঘাতে মাতৃহত্যা করিতে, সেই আঘাতেই তোমার পিতৃহত্যা করা হইত। বৎস! তুমি যে, অদ্বৈত ভক্তিযোগে একাধারেই প্রকৃতি-পুরুষের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, মাতার মধ্যেই পিতাকে দর্শন করিয়াছ, তুমি যথার্থই পিতৃভক্ত, কুলপাবন সন্তান। ধন্য আমি! যে তোমা হেন সুবিবেচক সুপুত্র লাভ করিয়াছি; আমার চিরকালোপার্জ্জিত তপস্যা সিদ্ধ হইল। যিনি মাতা, তিনিই পিতা, যিনি মাতৃভক্ত, তিনিই পিতৃভক্ত। পিতা, মাতা হইতে ভিন্ন নহেন, পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। এ গল্পটী ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা ক্ষুদ্র নহে।

মহাভারতের কথা।

বিদুরের খুদ।

দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাত-বাস হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। বিরাটরাজের ভবনে রাজকুমারী উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন

হইল। সেই বিবাহক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডব, সপুত্র দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও অন্যান্য রাজগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় পাণ্ডবগণের পৈতৃক-রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবেরাই সমস্ত পৈতৃকরাজ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, বিরোধ-পরিহারের জন্য, পাঁচখানিমাত্র গ্রাম লইয়াই, কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। তাঁহার তাদৃশ স্বার্থত্যাগে সকলেই বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। যাহাতে জ্ঞাতি-বৈরে অসংখ্য লোকসংহার না হয়, যুধিষ্ঠিরের তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কুরুসভায় গিয়া, ঐরূপ সন্ধিপ্রস্তাবের ভার, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধিপ্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথ বিবিধ উপচারে সজ্জিত হইল। সুবিস্তীর্ণ মার্গের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণ কুম্ভ, বিচিত্র তোরণাবলী, ধ্বজ-পতাকা ও যান-বাহনাদি স্থাপিত হইল। পথের স্থানে স্থানে সর্ব্বভোগসম্পন্ন, অপূর্ব্ব বিশ্রামশালা নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমোদ ও উৎসবের ব্যবস্থা হইল। যান, বাহন, বস্ত্রালঙ্কার, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি প্রলোভনসামগ্রী-প্রদানপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য, ধৃতরাষ্ট্র কোনও উপায়েরই

ত্রুটি করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায় জানিয়া, কৌরবগণ সপরিবার রাজপুরীর বহির্দ্বারে পূজোপহার লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা, যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া, সুসজ্জিত রাজভবনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর অভিবাদন, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি শিষ্টাচার অনুষ্ঠিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন,—আপনি এ কুরুকুলের পরমাত্মীয়। সম্পর্কে পাণ্ডবেরা ও আমরা আপনার তুল্য আত্মীয়। আপনি যখন পাণ্ডবগণের অন্ন সাদরে ভোজন করেন, তখন আমাদের অন্নও আপনাকে ভোজন করিতে হইবে। প্রত্যাখান করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন,—সত্য বটে, আমি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়, কিন্তু এ জগতে অন্ন-ভোজনের দুইটীমাত্র স্থল আছে। প্রথম প্রীতিদত্ত অন্ন এবং দ্বিতীয় আপদন্ন (১), অর্থাৎ অন্যের প্রীতিদত্ত অন্ন ভোজন করিবে, এবং যখন অনশনে মৃত্যু উপস্থিত, সে অন্ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই, তখন অন্যের সে অন্ন

(১) "সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্‌ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্‌! ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্‌॥"
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়।)

ভোজন করিবে। ইহার নাম আপদন্ন। হে রাজন্! আমি পাণ্ডবের সখা বলিয়া, আমার প্রতি আপনার আন্তরিক প্রীতি নাই। আর, আমি এক্ষণে এমন কোনও বিপদেও পড়ি নাই, যে, আপনার অন্ন ভোজন না করিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। কৃষ্ণের অখণ্ড্য যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন নীরব হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদির দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। কারণ, তাহারা কৃষ্ণের জন্য আহৃত সমস্ত ভক্ষ্য-পানীয়ে সুতীব্র গরল গোপনে মিশ্রিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত যে, কৃষ্ণ সহায় বলিয়াই পাণ্ডবদিগের এতদূর প্রভাব। কৌশলে কৃষ্ণকে নিপাতিত করিলেই, বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের হস্তগত হইবে। কিন্তু বিশ্ব-চক্রীর চক্রে যে, দুষ্টের চক্রান্ত চূর্ণ হয়, তাহা তাহারা জানিত না।

এইরূপে সেই দীনদয়াল, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের প্রদত্ত দুর্লভ রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র বিদুরের গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তদীয় ভক্তিদত্ত শাকান্ন ভোজন করিয়া অতুল তৃপ্তি লাভ করিলেন। তদবধি "বিদুরের খুদ" বলিলে ভক্তের অন্ন বুঝায়। ভক্ত ভগবানের, এবং ভগবান্ ভক্তেরি। অভিমানে ত্রিদিবের সুধা ঢালিয়া দিলেও, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না।

রামায়ণের কথা।

লক্ষ্মণ। (১)

পিতৃসত্যপালনার্থে রামচন্দ্র সীতার সহিত বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইতে চাহিলেন। রাম নানা যুক্তি ও উপদেশ দ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া, কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—আর্য্য! আমি জন্মাবধি আপনারি অনুরক্ত। শৈশবে মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া আপনারি কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছি। স্বপ্নে আপনার সঙ্গহারা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছি। আমি আপনাকে ছাড়িয়া ক্ষণমাত্রও বাঁচিব না। সূর্য্যও যদি নিজ উত্তাপকে ছাড়িতে পারে, হিমালয়ও যদি শৈত্যকে ছাড়িতে পারে, মাতাও যদি রোগার্ত্ত শিশুকে ছাড়িতে পারে, তথাপি আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আপনার সহিত বিরহের কথা মনে করিলেই, আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, আমার প্রাণনাড়ী বিশুষ্ক হইয়া যায়, যুগপৎ শত শত মৃত্যুযাতনায় আমি বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া পড়ি। আপনাকে ছাড়িয়া ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য বা অমরত্বও কামনা করি না।

---

(১) ইহাতে লক্ষ্মণচরিত্রের কয়েকটামাত্র ঘটনা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

আমি ধনুর্বাণ লইয়া, আপনার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া গমন করিব, পথে কণ্টকাদি বাধা স্বহস্তে অপনয়ন করিব। নিত্য নিত্য মধুর ফল-মূল-জলাদি আহরণ করিয়া, আপনাকে ও আর্য্যাকে ভোজন করাইব। আপনাদের বাসের জন্য মনোমত পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিব, এবং তাহা আপনাদের প্রীতিকর ও ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যজাতে পূর্ণ রাখিব। সুদুর্গম নগ-নদী ও নির্ঝরাদি হইতে আপনার জন্য নির্ম্মল-মধুর পানীয় আহরণ করিব। আর্য্যা জানকীর সহিত আপনি অরণ্য-সানু-কন্দ-রাদি ভয়সঙ্কুল স্থানে বাস করিবেন, আমি আপনাদের জাগরণে ও নিদ্রায় সকল বিঘ্ন-বাধার অপনোদন করিব। আপনারা আমার পরিচর্য্যায় বনবাসক্লেশ জানিতে পারিবেন না। হে দয়াময়! আর্য্য! এ আজন্ম-পদাশ্রিত ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, নহিলে আমার এই অন্তিম প্রণাম গ্রহণ করুন।

করুণাময় রামচন্দ্র, প্রাণাধিক লক্ষ্মণের কাতরতা-পূর্ণ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কহিলেন, যদি একান্তই তুমি আমার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তবে অগ্রে পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ কর। আমার ও তোমার নিজস্ব ধন-রত্ন-বস্ত্রালঙ্কারাদি যাহা কিছু দ্রব্য আছে, সে সকলি সৎপাত্রে দান কর, এক কপর্দ্দকও শেষ রাখিও না। কেবল পরিধেয় বল্কল ও ধনুর্ব্বাণমাত্র আমাদের সম্বল। রাম ঐ কথা বলিলে, লক্ষ্মণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। উভয়ের যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল, সকলি সৎপাত্রে দান করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ পিতার

অনুমতি লইয়া, মাতৃচরণে অনুমতি চাহিলেন। নারী-হৃদয়ের মূর্ত্তিমতী উদারতা লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা, পুত্রের তাদৃশ জ্যেষ্ঠ-ভক্তি-দর্শনে পুলকিত চিত্তে প্রাণাধিক পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন, আনন্দাশ্রুধারায় পুত্রের দেহ অভিষিক্ত করিলেন, স্নেহভরে তদীয় বদনকমলে চুম্বন করিয়া, হর্ষগদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—অহো! আজি আমার কি সৌভাগ্য! আমার গর্ভধারণ সার্থক। বৎস! তোমার ঈদৃশ জ্যেষ্ঠভক্তি-দর্শনে আজি আমি ধন্যা! এ মহাবংশে ত এমনি সুসন্তান হওয়াই উচিত। বৎস! তোমাকে আর অধিক কি বলিব? জ্যেষ্ঠানু-বৃত্তিই এ মহাবংশের সনাতন আচার। তুমি যাবজ্জীবন এ কুলধর্ম্ম পালন করিও। দেখিও, যেন রাম ও মা জানকীর সেবায় কদাচ তোমার ত্রুটি না হয়। বৎস!—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত! যথাসুখম্॥"

—রামকে দশরথ জানিও—জানকীকে 'আমি' জানিও—দণ্ডকারণ্যকে অযোধ্যাপুরী জানিও, বৎস! পরমানন্দে গমন কর। এমন মা না হইলে, এমন সুসন্তান কি সম্ভবে?

গুরুভক্তি ও আত্মসংযম বীরত্বের মুখ্য উপাদান। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠভক্তি ও ইন্দ্রিয়সংযমের তুলনা নাই। এইরূপ কিংবদন্তী, যে, লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসকালে সম্পূর্ণ অনাহারে ও অনিদ্রায়, সপত্নীক জ্যেষ্ঠের সেবা করিয়াছিলেন। বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে লিখিত আছে,—লক্ষ্মণ বিশেষ

বিশেষ বিপদের সময়ে অনাহারে ছিলেন, অন্যান্য সময়ে অগ্রজের প্রসাদীকৃত যৎসামান্য ফলমূলমাত্র ভোজন করিতেন। নিশাকালে সশস্ত্র হইয়া, নিদ্রিত সীতা-রামের রক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। কখনও কখনও এরূপ জাগরূকভাবে ঈষৎ নিদ্রা যাইতেন, যে, বনমধ্যে একটী পত্রের মর্ম্মর-শব্দেই জাগিয়া উঠিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ লইয়া উত্থিত হইতেন।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, রামচন্দ্রের সীতা-বিয়োগে প্রকাশ পাইয়াছিল। সীতাবিয়োগবিধুর, শোকোন্মত্ত রামচন্দ্রের সে করুণ পরিদেবনে বনের বৃক্ষ-শিলারাও দ্রবীভূত হইয়াছিল, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে সময়, লক্ষ্মণ নিজের শোকাবেগ-সংবরণপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের সেবায় ও সান্ত্বনায় যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মানবকল্পনার অতীত। স্নেহময়ী জননী যেমন রোগবিহ্বল শিশুসন্তানকে এক নিমেষও নয়নের অন্তরাল করেন না, লক্ষ্মণও তেমনি শোকবিহ্বল রামচন্দ্রকে অহোরাত্র নিমেষের জন্যও নয়নের অন্তরাল করেন নাই। তখন একমাত্র লক্ষ্মণই রামের জীবনী শক্তি, লক্ষ্মণের সাহায্যেই রাম সে ব্যসনসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সীতার তাদৃশ নিরুদ্দেশ ও সীতাশোকে রামের সেই ঘোরতর শোকোন্মাদ, এই দুই দুর্ঘটনা যুগপৎ ক্রকচের ন্যায় লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থান ছেদন করিতেছিল। লক্ষ্মণ ধৈর্য্যবলে সে দুঃসহ আত্মবেদনা সংযত করিয়া, রামকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণচরিত্রে আরো একটী আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর অহোরাত্র সীতাদেবীর সেবা করিয়াছিলেন, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগামী, তথাপি সেই আর্য্যপত্নীর পদতল ভিন্ন আর কোনও অঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। তাঁহার নিকট সীতামূর্ত্তি—সীতার পাদপদ্ম।

সীতাহরণের পর, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যখন সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা হইল, তখন সুগ্রীব কয়েকখানি অলঙ্কার আনিয়া রামকে কহিলেন,—রাবণ কোনও রমণীকে হরণ করিয়া, ঊর্দ্ধলোক দিয়া বিমানারোহণে যাইতেছিল। সে যখন এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করে, তখন সেই রমণী কয়েকখানি অলঙ্কার অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া, এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভূষণগুলি আমরা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছি। দেখুন দেখি! এ সকল ভূষণ সীতাদেবীর কি না? ইহা বলিয়া, সুগ্রীব সেই অলঙ্কারগুলি রামের সম্মুখে রাখিলেন। সীতার অঙ্গাভরণ এই কথা শুনিবামাত্র, রামের পদ্মপলাশতুল্য লোচনযুগল বাষ্পসলিলে ভাসিতে লাগিল, তাঁহার দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হইল। তিনি স্বয়ং দেখিতে অক্ষম হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন,—বৎস! দেখ দেখি! এ সকল ভূষণ তোমার ভ্রাতৃজায়ার কি না? আমি অবিরল বাষ্পধারায় অন্ধ হইয়াছি, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন,—"আর্য্য! আমি আর্য্যাদেবীর কেয়ূর, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার চিনিতে পারিব না। আমি নিত্য নিত্য

তাঁহার চরণবন্দনার সময়, তাঁহার পদতলমাত্র দেখিয়াছি (১)। এজন্য তাঁহার পদতলের ভূষণই চিনিতে পারি।" সৌমিত্রির এই সর্ব্বত্যাগিনী, একনিষ্ঠা দৃঢ়ভক্তির ও আত্মসংযমের তুলনা নাই। এজন্য, অদ্যাপি ভারতললনারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন,—"যেন আমার লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর হয়।" লক্ষ্মণ যথার্থ মাতৃভক্ত। জননী সুমিত্রা তাঁহাকে বিদায়কালে বলিয়াছিলেন,—"বৎস! জানকীকেই তোমার মা বলিয়া জানিও।" লক্ষ্মণ সে মাতৃ-নিদেশ-পালনে নিযুক্ত হইয়া, ভক্তি ও সংযমের এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, যে, তাহা তাঁহার মাতারও কল্পনাতীত।

রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধে, বীর লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইলে, রাবণ তদবস্থ লক্ষ্মণকে লইয়া পলায়ন করিতে উদ্যম করিল। রাম তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ভীষণ যুদ্ধে রাবণকে পরাভূত করিলেন। সে যুদ্ধে মুহূর্ত্তমধ্যে বিপুল রাক্ষসসেনা নিহত হইল। রামবাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া রাবণ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন রাম সেই রক্তাক্তদেহ অচেতন লক্ষ্মণকে বক্ষে লইয়া দ্রুতপদে শিবিরে আগমন করিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া বৈদ্যরাজ সুষেণকে

---

(১) "নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥"
(রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ২২ শ্লোক।)

কহিলেন,—দেখ, সুষেণ! দুরাত্মা রাবণ আমার লক্ষ্মণের কি দশা করিয়াছে! বিষম শেলের আঘাতে লক্ষ্মণের হৃন্মর্ম্ম বিদীর্ণ ও দেহ বিবর্ণ। ইহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ এক-একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভ্রাতার এ দশা দেখিয়া আমার শোকানল সহস্র শিখায় প্রজ্বলিত; আমার আর যুঝিবার শক্তি নাই। হায়! লক্ষ্মণই যদি প্রাণত্যাগ করিল, তবে আমার বিজয়লাভে ও সীতার উদ্ধারে কি প্রয়োজন? আমার বীর্য্য যেন নিজেই লজ্জিত হইতেছে, আমার দেহ অবশ ও অবসন্ন। নয়নজলে আমার চক্ষু অন্ধ, আমি কিছুই দেখিতে পাই না। বুঝি আমার অন্তিমকাল উপস্থিত!

লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া, রাম এইরূপে আকুলপ্রাণে রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—আর আমার এ যুদ্ধকার্য্যে ও সীতার উদ্ধারে প্রয়োজন নাই। এ জীবন আর ক্ষণমাত্র রাখিতে ইচ্ছা নাই। দেশে দেশে কলত্র ও বন্ধু মিলিত পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিনা, যথায় গিয়া লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতাকে পাইব!

অনন্তর তিনি সেই বিচেতন লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভাইরে! তুমি আমারি জন্য, পিতা, মাতা ও জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলে! ভার্য্যা, আত্মীয়, রাজভোগ সকলি পরিত্যাগ করিয়াছিলে! অনাহার, অনিদ্রা, বাত, বর্ষ, আতপ, কিছুই গণ্য কর নাই। তোমাকে হারাইয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব? তোমাকে হারাইয়া আমি কোন্ মুখে

অযোধ্যায় যাইব ? সেই পুত্রপ্রাণা সুমিত্রা মাকে গিয়া কি বলিব ? আমি পুত্রশোকার্ত্তা মাতার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুনিতে পারিব না। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী মাতাকেই বা কি বলিব ? ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কি বলিব ? যখন সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—আমাদের প্রাণাধিক লক্ষ্মণ তোমার সঙ্গে বনে গিয়াছিল, তুমি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ? আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ? অহো ! এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হউক, আমাকে যেন আর দেশে গিয়া মুখ দেখাইতে না হয়। জানিনা, পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম ! সেই পাপে আমার সম্মুখেই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, পরমধার্ম্মিক, ভ্রাতৃরত্নকে হারাইলাম !

হে শূরবর ! হে শীলনিধে ! মদেকজীবিত ! তুমি আমাকে ছাড়িয়া একাকী পরলোকে চলিলে ? তুমি ত আমাকে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পার না ! তুমি ত আমার চক্ষে জল দেখিতে পার না। দেখ ! আমি নয়নজলে ভাসিতেছি। আমি শোকভরে একটু রোদন করিলেই, তুমি উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমাকে বক্ষে ধারণ করিতে ও কতই সান্ত্বনা দিতে ! হায় ! এখন আমার এ গগনভেদী আর্ত্ত-নাদেও তুমি কর্ণপাত করিলে না ! আমার প্রতি তুমি ত কখনও নিষ্ঠুর নহ। দেখ ! পিতৃগৃহে অগ্রে আমার, পশ্চাৎ তোমার জন্ম ; অস্ত্রশিক্ষায় ও বেদাদিশিক্ষায়, অগ্রে আমার দীক্ষা, পশ্চাৎ তোমার দীক্ষা। জনকভবনে অগ্রে আমার,

পশ্চাৎ তোমার বিবাহ। এইরূপে সর্ব্বকার্য্যে তুমি আমাকেই অগ্রগামী করিয়াছ; হায়! আজি তোমার এ কি অনুচিত ব্যবহার! যে, তুমি যমভবন-যাত্রায় আমার অগ্রগামী হইলে! ভাই! উঠ! উঠ! দেখ!—আমার কি দশা ঘটিয়াছে! আমি সীতাশোকে উন্মত্ত হইয়া যখনি হাহাকার করিয়াছি, যখনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি, তুমি আমার স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, আমাকে ক্রোড়ে লইয়া কত সান্ত্বনা দিয়াছ! কত শুশ্রূষা করিয়াছ! কত যত্নে আমার চৈতন্যসম্পাদন করিয়াছ। হায়! আজি আমার এ দশা দেখিয়াও. তুমি কিরূপে নীরবে রহিলে? আমি নিজ বক্ষে সহস্র শক্তিশেল সহ্য করিতে পারি, সহস্র সীতাবিয়োগও আমার সহ্য হয়, কিন্তু ভাই! তোমার বিয়োগ-ব্যথা আমার অসহ্য। যে মুহূর্ত্তে এ শক্তিশেল তোমার বক্ষে পতিত হইল, সেই মূহূর্ত্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইল না কেন? ভ্রাতৃপ্রাণ রাম এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। বৈদ্যরাজ সুষেণ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন,—হে নরবীর! এ প্রাণশোষিণী দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। লক্ষ্মণের লক্ষণসকল দেখিয়া বুঝিতেছি, ইনি জীবিত আছেন। ইহাঁর মুখমণ্ডল কিছুমাত্র বিবর্ণ বা বিকৃত হয় নাই, সুপ্রভ ও সুপ্রসন্ন দেখিতেছি। ইহাঁর লোচন ও করতল অবিকৃত; সকল অঙ্গেই সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। গতাসুর আকার এরূপ হয় না। আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন। ইনি জীবিত আছেন। ইহা বলিয়া সুষেণ হনূমানকে কহিলেন,—হে বীর! তুমি পবনবেগে

গিয়া গন্ধমাদন নামক পর্ব্বত (১) হইতে বিশল্যকরণী মহৌষধি আনয়ন কর। অদ্ভুতশক্তি হনূমান অবিলম্বে ঔষধি আনিয়া দিলেন। সুষেণ সেই সঞ্জীবনী মহৌষধি দ্বারা সৌমিত্রিকে উজ্জীবিত করিলেন। লক্ষ্মণ বিশল্য হইয়া উঠিলে, চতুর্দ্দিকে হর্ষোন্মত্ত কপিসেনার দিগন্তব্যাপী আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

রাম আনন্দাশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া সৌমিত্রিকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—ভ্রাতঃ! কি সৌভাগ্য আমার, যে তুমি জীবন-লাভ করিলে! তোমাকে হারাইলে, আমার সীতা-উদ্ধার, রাজ্যলাভ ও জীবনধারণে কোনও প্রয়োজন ছিল না। তোমার শোকে আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিতাম। লক্ষ্মণ তখন অতিমাত্র দুর্ব্বল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? হে সত্যপরাক্রম! রাবণ-সংহার করিয়া সীতাদেবীর উদ্ধার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে হীনতেজা ব্যক্তির ন্যায় শোকাবেগে সে প্রতিজ্ঞা বিফল করা আপনার উচিত নয়। মহাপ্রলয়েও ভবাদৃশ সত্যবাদী মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হয়েন না। আজি দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। মাদৃশ কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-মরণ আপনার সত্যপালনের নিকট অতীব তুচ্ছ। আর্য্য! আমি আর কিছুই চাহিনা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন, এ দাস আপনার কার্য্যে এ নশ্বর জীবন দান করিয়া কৃতার্থ হয়।

---

(১) ভাগবতপুরাণে "গন্ধমাদন" গিরি, ইলাবৃতবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষ এই উভয়ের সীমাপর্ব্বত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

রাজা রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জনের চরমসীমা যেমন জানকী-বিসর্জ্জন, লক্ষ্মণের কঠোর কর্ত্তব্যপালনের চরমসীমা তেমনি উক্ত ভীষণ রাজাজ্ঞার পরিপালন। দুর্ব্বৃত্ত দশাননের গৃহে বাস করায় জ্বলদনলতুল্য তেজোময়, ভুবনপাবন সীতাচরিত্রেও লোকাপবাদ রটিল। সুদূর সমুদ্রপারে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথায় সকলের বিশ্বাস হইল না। রাম গূঢ়চর-মুখে সীতাচরিত্রে সেই বিষম কলঙ্কের কথা শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, লোকসমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, ইতরসাধারণে তাহার অনুসরণ করে (১) অতএব মাদৃশ-রাজচরিত্রে এ কলঙ্ক আমি প্রাণান্তেও রাখিব না। অবিলম্বে এ কলঙ্কের উন্মূলন করিতে হইবে। নহিলে, লোকসমাজে ইহার ফল বড় বিষময় হইবে। বিশেষতঃ আমি রাজ্যাভিষেককালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—"প্রজারঞ্জনের জন্য, আমার রাজ্য, দেহ, প্রাণ ও প্রাণেরও অধিকা জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে আমি বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইব না (২)। আমার প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘ্য; প্রজারঞ্জনই আমার সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য।"

সীতাকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধা জানিয়াও, সেই নিরপরাধা, পূর্ণগর্ভা, ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, মুদ্গরাঘাতে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড যেমন ভগ্ন হয়, তেমনি করুণাময় রামের

(১) "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

(২) "রাজ্যং চ বসু দেহঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

হৃদয় শোকক্ষোভে বিদীর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুজগণকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া, সীতাবিসর্জ্জনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার জননী প্রভৃতি গুরুজনেরা বা তাঁহার প্রাণাধিক অনুজেরা, কেহই তাঁহাকে এ নিষ্ঠুর সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই সাংঘাতিক রাজাজ্ঞাপালনের ভার লক্ষ্মণের উপর পতিত হইল। লক্ষ্মণ, যে সতীকুলারাধ্যা, মাতৃরূপিণী আর্য্যপত্নীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার উদ্ধারের জন্য, তিনি বজ্রাধিক ভীষণ শক্তিশেলকেও বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার সুখ-শান্তির জন্য তিনি নিজ জীবনকে তৃণকণার ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, আজি সেই পূর্ণগর্ভা, সতীত্বমূর্ত্তি সীতাদেবীকে তিনি কোন্ প্রাণে তপোবনদর্শনচ্ছলে শ্বাপদসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়া আসিবেন? এ কার্য্য ত নৃশংস রাক্ষসেও করিতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্মণের আর কোনও দিক্ ভাবিলে চলিবে না। রাম রাজা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজা লোকের মহতী দেবতা (১)।

(১) সর্ব্বলোকের রক্ষাকর্ত্তা রাজাকে "নররূপিণী মহতী দেবতা" বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুসলমান-শাস্ত্রেও রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ছায়া বলিয়া অভিহিত।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

রাজাজ্ঞাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাদেশ জ্ঞান করিয়া পালন করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। জ্যেষ্ঠভ্রাতাও পিতৃতুল্য গুরুজন। "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"—গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারেই পালনীয়। বীরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি কঠোর কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে পিতৃবংশের কলঙ্কস্বরূপ। লক্ষ্মণ নিজের সাংঘাতিক মর্ম্মবেদনাকে অতিকষ্টে হৃদয়মধ্যে সংযত করিয়া, সীতাদেবীকে তপোবনদর্শন-ব্যপদেশে বাল্মীকি-তপোবনের নিকট পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। সেই নিদারুণ রাজনিদেশ সীতাকে শুনাইবার সময়, সৌমিত্রি বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সে সময় সীতা তাঁহাকে শিশুসন্তানের ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া, বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন ও সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। অলীক লোকাপবাদে, সেই অপাপস্পৃষ্টা, নিরপরাধা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করায়, সেই পতিব্রতার বদন হইতে পতির

যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥"

(ইত্যাদি, মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়।)

—দেশ অরাজক হইলে, লোকসমাজ দস্যু-তস্করাদির উপদ্রবে ছিন্ন ভিন্ন হয়, এজন্য ঈশ্বর সর্ব্বলোকের রক্ষার্থে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহার প্রসাদে লোক, সৌভাগ্য ও মহত্ব লাভ করে, এবং যাঁহার কোপে পড়িলে সর্ব্বনাশ হয়, তাঁহাকে সর্ব্বতেজের আধার বলিয়া জানিবে। রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে মনুষ্য ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে না; কেন না, রাজা নররূপিণী মহতী দেবতা।

প্রতি একটীও অপ্রিয় বাক্য নির্গত হয় নাই। তিনি আপনাকেই চিরদুঃখভাগিনী জানিয়া, বারংবার নিজের ভাগ্যনিন্দা করিয়াছিলেন, এবং জন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীশ্বরমহিষী যে সীতা পূর্ব্বরাত্রে কৈলাসতুল্য প্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদে শিবতুল্য পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, পরদিন সেই সীতাকে শরণার্থিনী হইয়া, দরিদ্র বাল্মীকির পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল! মানবভাগ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন!

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

—:0:—

(রামের মহাপ্রস্থান।)

বনবাসাবসানে রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিকারকালে রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, পাপ, তাপ, প্রভৃতি অকল্যাণ উপকথা-মধ্যে গণ্য হইল। ফলতঃ রামরাজ্যে বাস করিয়া কেহই স্বর্গবাস কামনা করিত না। রাজা লোভশূন্য, এজন্য প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইল। তিনি সকলের বিঘ্নভয় হরণ করিতেন, এজন্য প্রজারা ক্রিয়াবান্ হইল। শিক্ষাদানগুণে তিনি সকলের পিতা এবং প্রজাবাৎসল্যগুণে সকলের মাতা হইলেন। এই জন্যই অদ্যাপি 'রামরাজ্য' বলিলে, কি এক আনন্দময়, শান্তিময়, ঐশ্বর্য্যময়, অজর, অশোক ধর্ম্মরাজ্য বুঝায়!

সীতানির্ব্বাসনের পর রামচন্দ্র সর্ব্বভোগত্যাগী হইয়া, নির্লিপ্তভাবে রাজকার্য্য করিতেছিলেন। অনন্তর সীতাদেবী পুনঃপরীক্ষাদানের জন্য মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক রাজসভায় আনীত ও শেষে রসাতলে বিলয়প্রাপ্ত হইলে, রামচন্দ্র নিজ যমজপুত্র কুশ-লবকে পরম যত্নে গ্রহণ করিলেন। আত্মার অবিকল প্রতিরূপ সেই দুই পুত্ররত্নই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল হইল।

একদা মুনিবেশধারী এক তেজঃপুঞ্জ দিব্যপুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা জানাইলেন। প্রতিহারী গিয়া তদীয় আগমনসংবাদ রামকে নিবেদন করিল। রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে গিয়া তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া, তাঁহাকে দিব্যাসনে বসাই-লেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই তেজোরাশি পুরুষ রামকে কহিলেন,—নির্জ্জনে একাকী আপনার সহিত আমার গোপনীয় কথাবার্ত্তা হইবে; সে সময় যদি কেহ সে স্থানে আগমন করে, তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। রাম তাঁহার শপথে আবদ্ধ হইয়া, লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন, এবং সেই শপথের কথা লক্ষ্মণকে জানাইলেন। অনন্তর সেই পুরুষ রামকে কহিলেন,—আমি কালপুরুষ; ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া-ছেন। তিনি আপনাকে জানাইতেছেন,—আপনি রাবণসংহার প্রভৃতি দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে বৈকুণ্ঠধামে গিয়া স্বাধিষ্ঠান অলঙ্কৃত করুন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মহা-তেজা মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামদর্শনার্থী হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অবিলম্বে গিয়া আমার আগমনসংবাদ রামকে দাও। লক্ষ্মণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—ভগবন্! এ সময় আর্য্য রামচন্দ্র কোনও পুরুষের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছেন, আপনি কৃপা করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। অমর্ষণ মহর্ষি দুর্ব্বাসা, কালবিলম্বের কথা শুনিয়াই ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন, এবং রোষপরুষস্বরে কহিলেন,—তুমি যদি এই মুহূর্ত্তেই আমার আগমনসংবাদ রামকে না দাও, তবে শাপা-নলে রাজ্য-সহিত রামকে ভস্মসাৎ করিব। লক্ষ্মণ ভাবিলেন, এ সময় এ সংবাদ আর্য্যকে না দিলে, তিনি সমূলে বিনষ্ট হইবেন, এবং এ সংবাদ দিলে আমি বিনষ্ট হইব। এস্থলে আমার প্রাণত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য। আর্য্যের অনর্ঘ্য জীবনের নিকট মাদৃশ সেবকের জীবন কিছুই নয়। তিনি ইহা ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বাসার আগমনসংবাদ রামকে জানাইলেন। রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে আসিয়া মহর্ষির অভ্যর্থনা করিলেন। রামচন্দ্রের ভক্তিপূর্ণ আতিথ্যলাভে ও বিনয়মধুর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচরণে পতিত হইয়া, করযোড়ে কহি-লেন,—আর্য্য! আপনি কালপুরুষের নিকট যে শপথ করিয়া-ছেন, তদনুসারে আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমাকে

প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিন। হে দীনদয়াময়! আশ্রিতবৎসল! অজ্ঞানবশতঃ এ দাস আপনার চরণে যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। বিধাতা করুন, যেন আমি জন্ম জন্ম আপনারই সেবক হই, আমার আর কোনও অভিলাষ নাই। লক্ষ্মণের কথায় রাম স্তম্ভিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার মুখে কথা সরিল না, কেবল গণ্ডদ্বয় বহিয়া দরদর ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, লক্ষ্মণ মধুরবাক্যে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি কাতর হইবেন না। আপনি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব? সংসারের গতিই এইরূপ। চিরদিন কেহ কাহারও সঙ্গলাভ করিতে পারে না। জীবলোকে অহরহঃ অনুক্ষণ এইরূপ বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সংসারের সকল ঘটনাই কালমূলক। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। আমার জন্য আপনি ব্যথিত হইলে, আমি পরলোকেও সুখী হইব না। হে সৌম্য! আমাকে আপনি প্রফুল্লমুখে বিদায় দিন, নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন। হে ইক্ষ্বাকুবংশধর! প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি সহস্র মৃত্যু স্বীকার করিব, সহস্র শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করিব, তথাপি আপনাকে সত্যভ্রষ্ট করিব না। আমি পরমানন্দে বিদায় চাহিতেছি; কর্ত্তব্য কার্য্য অবিলম্বেই সম্পন্ন করা উচিত। হে মহারাজ! যদি ভক্ত দাস বলিয়া আমার উপর আপনার স্নেহ থাকে,

তবে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে ত্যাগ করিয়া সত্যরক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, রাম শোকে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে উপস্থিত ঘটনা জানাইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহারাজ! আমি যোগবলে জানিয়াছি, এ সময় তোমার সহিত প্রাণাধিক লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ ঘটিবে। ইহা অলঙ্ঘ্য কালের নিয়োগ। তোমার প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে হইবে। তখন রামচন্দ্র সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুলোচনে কহিলেন,—প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! সত্যরক্ষার জন্য তোমাকে ত্যাগ করিলাম। সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ ও প্রাণদণ্ড, উভয়ই সমান, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা।

লক্ষ্মণ দ্বিরুক্তি করিলেন না, নিজ গৃহেও প্রবেশ করিলেন না। তিনি ভক্তিভরে আর্য্যচরণে প্রণামপূর্ব্বক একাকী নিঃশব্দে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া, সরযূতীরে গমন করিলেন, এবং তথায় পবিত্র সরযূজলে আচমন করিয়া, যোগবলে সমস্ত ইন্দ্রিয়স্রোত নিরুদ্ধ করিলেন। ক্ষণমধ্যেই তাঁহার ভৌতিক দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মণের মহাপ্রস্থানের পর, রাম আর পৃথিবীতে রহিলেন না। তিনি বুঝিলেন,—লক্ষ্মণের প্রস্থানের সঙ্গেই আমার পার্থিব জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। অবিলম্বে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়, অমাত্য,

পুরোহিত, সভাসদ্ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হনূমান, সুগ্রীবাদি বানরপতিরা এবং বিভীষণাদি রাক্ষসপতিরা এবং সমস্ত প্রজাপুঞ্জ আসিয়া রাজসভায় সমবেত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে দণ্ডায়মান হইল।

রামচন্দ্র তথায় ভ্রাতৃদ্বয়কে, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণকে, পুত্রগণকে, সুগ্রীবাদি সুহৃদ্বর্গকে ও সমস্ত প্রজাবৃন্দকে উপস্থিত দেখিয়া বিনয়মধুর বচনে সকলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—আমি অদ্যই মহাত্মা ভরতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, মহাপ্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ আমার প্রাণবায়ু লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি প্রাণশূন্য দেহ ধারণ করিতেছি। আমি যদি অবিলম্বে তাহার অনুগমন না করি, তবে আমার ধর্ম্ম মিথ্যা এবং সেই মদেকজীবন লক্ষ্মণের প্রতি আমার স্নেহও মিথ্যা।

রামের মুখ হইতে ঐ ভয়ানক কথা উচ্চারিত হইবামাত্র, অকস্মাৎ যেন সমস্ত লোকের শিরে অশনিপাত হইল, সকলে থরথর কাঁপিতে লাগিল, এককালে সকলেরি সংজ্ঞালোপ হইল। ভরত সংজ্ঞালাভ করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া করযোড়ে কহিলেন, হে আর্য্য! হে দীনদয়াময়! হে শরণাগতবৎসল! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আমি আপনাকে ছাড়িয়া, তুচ্ছ রাজ্য কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না। আমাদের উপযুক্ত পুত্র কুশ ও লবকে সমস্ত সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিন। প্রাণাধিক অনুজ শত্রুঘ্নেরও

ইহাই অভিপ্রায়। অমরা উভয়েই আপনার অনুগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প।

যেরূপ শুষ্ক অরণ্যানীর এক প্রান্তে অগ্নি লাগিলে, বায়ুবেগে সেই অগ্নি হুহু করিয়া সমস্ত অরণ্যে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ ভরতমুখে ঐ কথা উচ্চারিত হইবামাত্র, সমস্ত প্রজামণ্ডলী সমস্বরে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। সকলেই রামানুগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তখন তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা স্বয়ং বিধাতারও অসাধ্য।

অনুগমনার্থী প্রজাবৃন্দকে রামচরণে নিপতিত ও করুণস্বরে রোরুদ্যমান দেখিয়া, করুণার্দ্রহৃদয় ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে বৎস! হে প্রজাজীবন রঘুনাথ! দেখ! তুমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তোমার সেই প্রাণাধিক প্রজাপুঞ্জ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আসিয়া, তোমার পদোপান্তে নিপতিত ও সংজ্ঞাশূন্য। বৎস! তুমি প্রজার জন্য কি না করিতে পার? যাহাদের অনুরঞ্জনের জন্য তুমি প্রাণপ্রতিমা জানকীকেও বিসর্জ্জন করিয়াছ, এবং বলিয়া থাক যে, আমার রাজ্য, বৈভব, দেহ, প্রাণ, সকলি প্রজারঞ্জনের জন্য পরিত্যাগ করিতে আমি বিন্দুমাত্রও ব্যথিত নহি; এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদের অপ্রিয় কার্য্য করিবে? বৎস! তোমার বিরহে রাজ্যে একপ্রাণীও জীবিত থাকিবে না, ইহা আমি দিব্যনেত্রে দর্শন করিতেছি। অতএব ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিও না। ইহারাও তোমার অনুগমন করুক।

কুলগুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের সেই অলঙ্ঘ্য আদেশবাণী শুনিয়া, রাম ভূপতিত প্রজাগণকে উত্থিত করিয়া, স্নেহমধুর বাক্যে কহিলেন,—আমি আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিব, বলুন! আপনাদের অনুরোধ আমার অলঙ্ঘ্য। তাঁহার সেই আশ্বাস-বাক্যে প্রজামণ্ডলী সানন্দে করযোড়ে নিবেদন করিল,—হে দয়াময় প্রভো! আপনি যথায় যাইবেন, আমরাও সেই স্থানে যাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা স্বর্গ-মোক্ষও কামনা করি না। যদি আমাদিগকে আপনার একান্ত শরণাগত ভক্ত বলিয়া আমাদের প্রতি আপনার দয়া ও স্নেহ থাকে, তবে আপনি আমাদিগকে এ আশায় নিরাশ করিবেন না। আমরা সকলেই স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত পরিবার সহ আপনার অনুগমন করিব, নহিলে আপনার সম্মুখেই আমরা প্রাণত্যাগ করিব। আপনার অনুগমনই আমাদের প্রিয়তম ও অভীষ্টতম কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা স্বর্গ-মোক্ষকেও তৃণজ্ঞান করি।

রামচন্দ্র গুরুর আদেশ অলঙ্ঘ্য এবং প্রজাবর্গের অনুরোধ অনিবার্য্য জানিয়া, তাহাদের প্রার্থনায় সম্মতি দিলেন। প্রজা-মণ্ডলীও পরমানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন রঘুনাথ চারি ভ্রাতার আট পুত্রকে সমস্ত সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন (১), এবং সেই দিনেই তাহাদের রাজ্যাভিষেকক্রিয়া

(১) রামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের রাজধানী কুশাবতী এবং কনিষ্ঠ লবের রাজধানী শরাবতী। ভরতপুত্র তক্ষের রাজধানী তক্ষশিলা, এবং

যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তৎকালোচিত দৈবকার্য্যাদি যথাবিধি সমাপনপূর্ব্বক, অনুজ ও প্রজাপুঞ্জ সহ মহাপ্রস্থান করিলেন।

কথিত আছে, তাঁহারা সকলেই পরমাত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া, সরযূজলে নিমজ্জনপূর্ব্বক ভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, দিব্য দেহে সনাতন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন।

এইরূপে সেই জনকল্লোলপূর্ণা, মহোৎসবময়ী, সুবিস্তীর্ণা, মহানগরী অযোধ্যা এককালে জনশূন্যা হইল। কোনও গৃহে আর এক প্রাণীও রহিল না। একটী প্রাণীরও স্পন্দন কুত্রাপি লক্ষিত হইল না। সকলি অদৃশ্য হইল, কেবল "রামরাজ্য" নামে একটী আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য জগতের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিল।

পুষ্কলের রাজধানী পুষ্কলাবতী (বা পুষ্করাবতী)। লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদের রাজধানী অঙ্গদী, এবং চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রবক্ত্রা। অঙ্গদী ও চন্দ্রবক্ত্রা, উভয় রাজধানী হিমালয়সন্নিহিত কারাপথ প্রদেশের অন্তর্গত। শত্রুঘ্নপুত্রদ্বয়ের রাজধানীর কথা রামায়ণে উল্লিখিত হয় নাই। অযোধ্যার সমস্ত প্রজা রামের অনুগমন করায়, সূর্য্যবংশীয়গণের সেই প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইল।

মহাভারতের কথা।

সত্যরক্ষা, ক্ষমা ও আত্মত্যাগ।

ভীষ্ম।

মহাত্মা ভীষ্ম কুরুবংশীয় মহারাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। কথিত আছে, ইনি গঙ্গাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃ-বরে ও নিজ সাধনার বলে কি শস্ত্রে, কি শাস্ত্রে, কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে, ভীষ্ম অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। ইহাঁর জন্মাবধি সমস্ত বাল্য-কাল মাতৃসকাশে মাতৃযত্নেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি পিতাকে চিনিতেন না। তাঁহার পিতা কে? তাহাও জানি-তেন না।

একদা শান্তনু মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলেন,—বেগবতী ভাগীরথীর প্রবল স্রোত রুদ্ধ হইয়া আছে। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করত দেখিতে পাইলেন,—এক তেজঃপুঞ্জ, অপূর্ব্বকান্তি শিশু অবিচ্ছিন্ন শরজালে গঙ্গাগর্ভ সমাচ্ছন্ন করায়, উহার স্রোত প্রতিহত হইয়াছে। সেই শিশুর অমানুষী মূর্ত্তি ও সেই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শন করিয়া, শান্তনু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইলেন। ইত্যব-সরে স্বয়ং গঙ্গাদেবী সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া মহারাজ শান্তনুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শান্তনুকে কহিলেন,—হে কুরুকুলনাথ! এই শিশু আপনারি সন্তান,

আমার গর্ভে ইহার জন্ম। আমি পরম যত্নে ইহাকে সাঙ্গ বেদাদি ও নিখিল শস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছি। ভগবান্ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কৃপা করিয়া ইহাকে সমগ্র যোগশাস্ত্র ও উহার গূঢ়রহস্যসকল শিখাইয়াছেন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বলেই এ বালক বলীয়ান্। আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন, ইহার প্রভাবে কুরুকুল ও সমস্ত বসুন্ধরা চিরধন্য হইবে।

শান্তনুর আর পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি সেই দেবদুর্লভ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া পুলকিত ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন, এবং সেই শিশুকে নিজগৃহে আনয়ন করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে সেই সর্ব্বগুণাধার পুত্রকে বিশাল কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ভীষ্ম নবযৌবনে অসীম সাম্রাজ্যের শাসনভার লাভ করিয়া, অনুপম ভুজবীর্য্যে, অলৌকিক শীলসৌন্দর্য্যে ও অদ্ভুত নীতিবিদ্যায় এবং অতুলনীয় পিতৃভক্তিগুণে নিজ পিতৃদেবকে ও সমস্ত প্রজাবৃন্দকে পরিতুষ্ট করিলেন। অচিরেই তদীয় যশঃশশাঙ্কের প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইলে, একদা মহারাজ শান্তনু যমুনাতীরবর্ত্তী কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক অপূর্ব্ব দিব্য পরিমল আঘ্রাণ করিলেন। তিনি সেই সৌরভের নিদান অনুসন্ধান জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক দিব্যরূপা কন্যাকে দর্শন করিলেন। তিনি সেই নিরুপমা সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কি জন্যই বা এই বিজন স্থানে একাকিনী আসিয়াছ? কন্যা কহিলেন, আমি দাসরাজের

কন্যা। পিতার আজ্ঞায়, ধর্ম্মকামনায় লোকদিগের নদীপারের জন্য বিনামূল্যে তরীবাহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি।

সেই কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য, যোজনব্যাপী দেহ-সৌরভ, বিনয়, পিতৃভক্তি ও নিঃস্বার্থ পুণ্যানুরাগ দর্শনে মহারাজ শান্তনু তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁহার পিতার নিকট গমন করিয়া, নিরতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে সেই কন্যারত্নকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাসরাজ তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন,—কুরুবংশাবতংস রাজাধিরাজ আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, এবং এজন্য তিনি স্বয়ং এ দাসভবনে উপস্থিত, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের কথা কি আছে? কিন্তু আমার একটী মনোবাঞ্ছা আছে, তাহা যদি আপনি পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করেন, তবেই আপনাকে কন্যাদান করিব। মহারাজ শান্তনু কহিলেন,—আমি অগ্রে তোমার প্রার্থনীয় বিষয় না জানিয়া, প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে পারি না। তুমি যাহা চাহিবে, যদি তাহা দিবার হয়, দিব; অদেয় হইলে দিব না। দাসরাজ কহিলেন,—আমার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্রই বংশপরম্পরাক্রমে আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। ধর্ম্মাত্মা শান্তনু তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিতে পারিলেন না, কেন না তাঁহার সর্ব্বগুণাকর, পরম ধার্ম্মিক, পিতৃভক্ত পুত্র ভীষ্ম বিদ্যমান। তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি তিনি অনুক্ষণ সেই নারীরত্নের

চিন্তায় দিন দিন নিরতিশয় কৃশ ও বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার সুখশান্তি এককালে তিরোহিত হইল। পিতৃভক্ত ভীষ্ম পিতার তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া, অতিমাত্র ভীত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে কাতরবাক্যে পিতাকে কহিলেন,—পিতঃ! আপনাকে ইদানীং নিরতিশয় বিষণ্ণ ও কৃশ দেখিতেছি। আপনি যেন সর্ব্বদা কোনও দুশ্চিন্তায় মগ্ন। পিতঃ! আপনার এ অবস্থা দেখিয়া আমি জীবন্মৃত হইয়াছি, আপনার জন্য নিদারুণ মনস্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া আপনার মনস্তাপের কারণ বলুন। আমি প্রাণ দিয়াও আপনার বিষাদের কারণ দূর করিব।

শান্তনু পুত্রের সেইরূপ কাতরতা দেখিয়া, তাঁহার নিকট নিজ মনোবেদনার কারণ আর গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—বৎস! তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ, আমি ভীষণ মনস্তাপেই এ দশায় উপনীত হইয়াছি। তুমি যেরূপ কাতর হইয়াছ, তোমার নিকট আর কিছুই গোপন করিব না। ইহা বলিয়া তিনি সেই কন্যাঘটিত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। ভীষ্ম পিতৃপদে প্রণাম করিয়া, প্রধান সচিব ও পুরোহিত প্রভৃতির সহিত অবিলম্বে সেই দাসরাজের ভবনে গমন করিলেন। তিনি দাসরাজকে কহিলেন,—মহাশয়! আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে আমার পিতাকে কন্যাদান করুন। ঐ কন্যার গর্ভজ সন্তানই পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী হইবে।

আমি রাজমুকুট স্পর্শ করিব না। তখন দাসরাজ কহিলেন,—ভবিষ্যতে আপনার পুত্র রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পারেন। তখন ভীষ্ম বাহু তুলিয়া বজ্রনাদে কহিলেন,—রাজ্যাধিকার ত আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম, পুনশ্চ এই সভাসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বিবাহ না করিয়া, আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। তাহা হইলে, আর আমার পুত্রলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ভীষ্মের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। অন্তরীক্ষ হইতে দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা বীরেন্দ্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। দাসরাজও সানন্দে শান্তনুকে কন্যাদান স্বীকার করিলেন। সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করায়, শান্তনুনন্দন তদবধি "ভীষ্ম" নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম দেবব্রত।

অনন্তর তিনি সেই দাসরাজকন্যা সত্যবতীকে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—মাতঃ! আমি আপনার সন্তান। আমার সঙ্গে রথারোহণে রাজধানীতে চলুন। তথায় যথাবিধি শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সত্যবতী পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনায় আগমন করিলেন। শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল। ক্রমে সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রথম পুত্রের নাম চিত্রাঙ্গদ, দ্বিতীয়ের নাম বিচিত্রবীর্য্য। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে, চিত্রাঙ্গদ হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাত্মা ভীষ্মদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী

হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ সুরাসুরবিজয়ী হইয়াও, মায়াবী গন্ধর্ব্বরাজের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সমরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ভীষ্ম বালক বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। একমাত্র ভীষ্মই তাঁহার সর্ব্বাচ্ছাদক হইলেন। ভীষ্ম বিমাতা সত্যবতীকে অসীম-ভক্তি-সহকারে সেবা করিতেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অতুল স্নেহসহকারে শিক্ষাদান করিতেন। ভীষ্ম স্বয়ং সর্ব্বভোগবিরত হইয়া, কেবল ভ্রাতার ও সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে, ভীষ্ম কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য যৌবনে ইন্দ্রিয়সেবায় অত্যাসক্ত হইয়া, ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করায়, কুরুবংশসিংহাসন শূন্য হইল। তখন সেই বিশ্বপূজিত রাজবংশের রক্ষার জন্য, সত্যবতী অতীব কাতরভাবে ও নিরতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে ভীষ্মকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সত্যব্রত ভীষ্ম মহাপ্রলয়েও সত্য হইতে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি কহিলেন,—মাতঃ! ত্রিলোকীর আধিপত্য অথবা তদপেক্ষা অধিকতর যদি কোনও ঐশ্বর্য্য থাকে, আমি তাহাও, আমার সত্যরক্ষার নিকট তুচ্ছজ্ঞান করি। আমাকে আপনি এরূপ অনুরোধ করিবেন না। আমি মা! আপনার আজ্ঞায় প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু সত্যত্যাগ

করিতে পারি না। পৃথিবীও যদি গন্ধ ত্যাগ করে, জলও যদি স্বাভাবিক সরসতা ত্যাগ করে, জ্যোতিও যদি স্বরূপকে ত্যাগ করে, বায়ুও যদি স্পর্শগুণকে ত্যাগ করে, সূর্য্যও যদি প্রভাকে ত্যাগ করে, স্বয়ং ধর্ম্মরাজও যদি ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্যত্যাগ করিতে পারি না।

ভীষ্মদেব দারপরিগ্রহে নিতান্ত বিমুখ হইলে, সেই মহাবংশের রক্ষার জন্য, বিচিত্রবীর্য্যের দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে নিয়োগধর্ম্ম দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ব্যাসদেবের ঔরস পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকার গর্ভে এবং পাণ্ডু অম্বালিকার গর্ভে জাত। রাজমহিষীদ্বয়ের এক দাসীর গর্ভে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞ, অশেষশাস্ত্রপারদর্শী ও মহাবলশালী হইয়াও জন্মান্ধতাদোষে রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশেষগুণালঙ্কৃত পাণ্ডু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ পাণ্ডু অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখী হইল। তিনি দিগ্বিজয় পূর্ব্বক বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া, অশ্বমেধাদি ভূরি ভূরি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

মহারাজ পাণ্ডু কিছুদিন রাজত্ব করিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক, দুই পত্নীকে লইয়া বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন,

দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র, এবং বনমধ্যে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এই তিন পুত্র, কুন্তীগর্ভসম্ভূত এবং যমজ নকুল ও সহদেব মাদ্রীর গর্ভজাত। মহারাজ পাণ্ডু মুনিশাপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, মাদ্রীদেবী আপনার শিশু পুত্রদুটীকে কুন্তীদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, পতির সহিত সহমৃতা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনুজ পাণ্ডুর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া, শিশুসন্তানগণের সহিত কুন্তীকে রাজভবনে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের লালনপালন করিতে লাগিলেন। দিন দিন বয়োবৃদ্ধির সহিত পাণ্ডবেরা শস্ত্রে ও শাস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির শারীরিক বলবীর্য্যে ও অস্ত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াও, আধ্যাত্মিক জ্ঞানগরিমায় ও চরিত্রমহিমায় সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপে পূজিত হইলেন। ভীমসেন শারীরিক বলে অপ্রতিম। কথিত আছে, তিনি দেহে অযুত মত্তহস্তীর বল ধারণ করিতেন, এবং গতিবেগে পবনতুল্য ছিলেন। অর্জ্জুন বিশ্বজয়ী বীর, এবং গুরুভক্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, দয়া ও আত্মত্যাগ প্রভৃতি সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন। নকুল ও সহদেব আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে ও শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াও, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, গণিতশাস্ত্রে, আয়ুর্ব্বেদে, গবাশ্বাদির লক্ষণজ্ঞানে, পালনে ও চিকিৎসায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপর দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, দুর্ম্মন্ত্রী দুঃশাসন, কর্ণ,

শকুনি ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি সহচরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, বিষ-প্রয়োগ, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি বীভৎস উপায়ে পাণ্ডবগণের ধ্বংস-সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বার্থদর্শী, ধর্ম্মপ্রাণ, প্রাজ্ঞ-বর বিদুরের গূঢ় সাহায্যে পাণ্ডবেরা নানা কৌশল করিয়া, শত্রু-গণের সে সকল উপায় ব্যর্থ করিয়াছিলেন। পৈতৃক সমস্ত কুরু-সাম্রাজ্য ধর্ম্মতঃ যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য হইলেও, ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতৃবিরোধ পরিহার জন্য, ভীষ্মের সম্মতি লইয়া, সাম্রাজ্য বিভাগপূর্ব্বক, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। দুর্য্যোধন হস্তিনায় ও যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, প্রজাপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের প্রজারঞ্জনগুণে যাবতীয় লোক তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা সসাগরা বসুন্ধরা জয় করিয়া, অভূতপূর্ব্ব সমারোহে রাজসূয় মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই মহাযজ্ঞে সমগ্র ভারতবর্ষের ও অন্যান্য জনপদের এবং সুদূর দ্বীপপুঞ্জের নরপতিবৃন্দ মহামূল্য উপায়ন লইয়া যুধিষ্ঠিরের পূজা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অদ্ভুত শিল্পী ময়দানব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের এক অত্যাশ্চর্য্য, অনির্ব্বচনীয় যজ্ঞসভা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনর্ঘ্য-মণি-মুক্তা-রজত-কাঞ্চনাদি-মণ্ডিতা স্তম্ভাবলী, হর্ম্ম্যমালা ও বেদিকা প্রভৃতি দ্বারা সেই সভা উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কৃত্রিম কমল-কুমুদ-কহ্লারাদি জলজপুষ্পে ও কৃত্রিম হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকাদি বিহঙ্গকুলে পরিশোভিত কৃত্রিম দীর্ঘিকা সকল, দর্শকমণ্ডলীর চিত্তে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। স্থানে

স্থানে স্বচ্ছ স্ফটিক-কাচাদি দ্বারা এরূপ ভিত্তি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, যে, সে সকল স্থান নিরাবরণ, শূন্যস্থান বলিয়াই বিশ্বাস হইত। নিমন্ত্রিত দুর্য্যোধন ও তাঁহার সহচরেরা সেই যজ্ঞসভা পরিদর্শনকালে কৃত্রিম বস্তুসকলকে অকৃত্রিম ভাবিয়া, বারংবার প্রতারিত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। যথায় ভিত্তি আছে, তাঁহারা সে স্থান ভিত্তিশূন্য, নিরাবরণ ভাবিয়া, গমনকালে ভিত্তিতে ঠেকিয়া আহত হইয়াছিলেন। কৃত্রিম জলাশয়কে অকৃত্রিম ভাবিয়া তাহার জল গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। কৃত্রিম পত্র-ফল-পুষ্পাদিকে অকৃত্রিম ভাবিয়া, তাহা তুলিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া উপহসিত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনায়, এবং পাণ্ডবগণের তাদৃশ অচিন্তনীয় বৈভবদর্শনে দুর্য্যো-ধনের ঈর্ষ্যানল শতগুণ প্রজ্বলিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের একেকালে সর্ব্বনাশসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ধর্ম্মদর্শী ভীষ্ম-বিদুরাদি পূজনীয় গুরুজনের বারংবার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি দ্বারা দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন।

অবশ্যম্ভাবিনী দৈবঘটনাকে কে রোধ করিতে পারে? যুধিষ্ঠির স্বয়ং সর্ব্বার্থদর্শী পরম জ্ঞানী হইয়াও ভ্রাতৃগণের ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেই সর্ব্বনাশকর দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের পক্ষে তদীয় মাতুল শকুনি দ্যূতক্রীড়া করিবেন, স্থির হইল। ইহাতে যে জয়-পরাজয় হইবে, তাহার

ফলভাগী দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির। দুরাশয় শকুনির চাতুরাপূর্ণ ক্রীড়াকৌশলে যুধিষ্ঠির ক্রমাগত পরাজিত হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে রাজ্য, ধন, সকলি হারাইলেন। তাঁহার ধূলি-গুঁড়ি পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইল। শেষে তিনি প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। দ্রৌপদীর উপর যে পঞ্চভ্রাতার তুল্য অধিকার, তিনি ধর্ম্মতঃ দ্রৌপদীকে পণ রাখিতে পারেন না, এ কথা আদৌ ভাবিলেন না। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির এইরূপই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অথবা, জগতের সকল ঘটনাই সেই মহাচক্রীর লীলা। তিনি কখন কি অভিপ্রায়ে কোন্ ঘটনা উপস্থিত করেন, মূঢ় মানব তাহা কি বুঝিবে? মঙ্গলময় যখন যাহা করেন, সকলি মঙ্গল, এই বিশ্বাসই মানবের সান্ত্বনা ও শান্তি। অবশেষে, শকুনির মায়াজালে ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকেও হারাইলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনের আজ্ঞায়, নরপিশাচ দুঃশাসন, একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া, তাঁহার যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিল। সভাস্থ লোকমণ্ডলী অবাক্ ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং কুরুবংশের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য জানিয়া, নীরবে অধোমুখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রাণা, সতীকুল-শিরোমণি গান্ধারী দেবীর কৃপায়, নির্জ্জিতা দ্রৌপদী স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ঈদৃশ দুর্ঘটনার পরও দৈবমোহিত যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সদর্প আহ্বানে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ও পরাজিত হইলেন। এবার পণানুসারে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে, দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিতে হইল।

তাঁহারা এই ত্রয়োদশ বর্ষ নানা স্থানে নানা সঙ্কটে পড়িয়াও, ধর্ম্মবলে শেষে সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর, জ্ঞাতিবিরোধ ও কুলক্ষয় পরিহার জন্য, যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্যের সমস্ত অধিকার ত্যাগ করিয়া, দুর্য্যোধনের নিকট কেবল পাঁচখানিমাত্র গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পতনোন্মুখ, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও দিতে চাহিলেন না। তখন উভয়পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী, এবং দুর্য্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও আনুষঙ্গিক অগণিত লোকবৃন্দ, সুবিশাল কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল।

ক্ষত্রিয়গণের অষ্টাদশদিনব্যাপী সেই ভৈরব আহবে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছিল। অবশিষ্ট দশজন মাত্র জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাতজন ও কৌরবপক্ষে তিন-জনমাত্র (১)। মহাভারতে অক্ষৌহিণীর সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—"এক রথ, এক গজ, পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনাতে এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী

(১) পাণ্ডবপক্ষে সাত জন;—পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৃষ্ণ ও সাত্যকি। কৌরবপক্ষে তিন জন;—কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা।

হয়। অতএব, এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ সংখ্যক রথ; ২১৮৭০ সংখ্যক গজ; ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ সংখ্যক অশ্ব থাকে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীতে ৩৯৩৬৬০ রথ, ৩৯৩৬৬০ গজ, ১৯৬৮৩০০ পদাতি, ১১৮০৯৮০ অশ্ব। একটী প্রকাণ্ড যুদ্ধ-ব্যাপারে অশেষবিধ শিল্পী, চিকিৎসক, ভারবাহক, খাদ্যসংগ্রাহক, বাদ্যকর প্রভৃতি যে কতপ্রকার কার্য্যের জন্য কতপ্রকার লোকের সাহায্য আবশ্যক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষতঃ হিন্দুরাজগণের পরিচারকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অতএব উক্ত যুদ্ধে কোটিসংখ্যকেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনপক্ষে যথাক্রমে,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য সেনাপতি ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি ছিলেন। ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধের পর শর-শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাঁচদিন ও কর্ণ দুইদিন যুদ্ধ করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হন। শল্য অর্দ্ধদিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠির-হস্তে নিহত হন। অবশেষে ভীমের সহিত দুর্য্যাধনের গদাযুদ্ধ অর্দ্ধদিনস্থায়ী।

এই সর্ব্বনাশঘটনার পূর্ব্বে, ভীষ্মদেব, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারী প্রভৃতি ধর্ম্মদর্শী হিতৈষীরা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি সমস্ত গুরুজনের সৎপরামর্শ পদদলিত করিয়া, সদর্পে রাজসভা হইতে উঠিয়া গেলেন। এইরূপে যখন সন্ধি-

স্থাপন অসম্ভব ও যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, তখন উভয়পক্ষেই যুদ্ধোপ-যোগী দ্রব্যাদির ও সৈন্যসামন্ত প্রভৃতির বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। ভীষ্ম স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী হইয়া, যে রাজবংশকে নানা সঙ্কট হইতে বারংবার রক্ষা করিয়াছেন, যে বিশ্বোজ্জ্বল কুরু-কুল তাঁহার বক্ষের অস্থি, আজি সেই রাজবংশের সংহার উপস্থিত দেখিয়া তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। অগত্যা তাঁহাকে দুর্য্যোধনপক্ষে যুদ্ধ করিতে হইল, কেন না, তিনি পূর্ব্বে রাজপদ ও পার্থিব সমস্ত বৈভব পরিহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রাজা দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত। অন্নদাতার সাহায্য করা অবিচারিতভাবেই কর্ত্তব্য। বয়সে, সম্পর্কে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও জ্ঞানে, সর্ব্ববিষয়েই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, দুর্য্যোধন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই সেনাপতিপদে বরণ করিলেন।

সুবিশাল কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষের চতুরঙ্গিণী সেনা ও সেনাপতিগণ সমবেত হইল। মহাপ্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন প্রকৃতিদেবী ক্ষণকাল নির্ব্বাত-নিঃশব্দ-গম্ভীর ভাব ধারণ করেন, তেমনি উদ্যতায়ুধ অগণিত বীরবৃন্দে সমাকীর্ণা সেই রণভূমি ক্ষণকাল নিঃশব্দ-গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রেই এককালে কোটি বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে; ক্ষণমধ্যেই সেই শ্যামল, সুন্দর, সুপবিত্র কুরুক্ষেত্র, সর্ব্বসংহারী মহাকালের ভৈরব তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তথাকার নদ-নদী-হ্রদ, তরু, লতা, মৃত্তিকা, সমস্তই নরশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইবে। সেই রৌদ্র মুহূর্ত্তে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রথ হইতে অবতরণ

করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ও গললগ্নীকৃতবাসে, সেই সৈন্য-সাগর ভেদ করিয়া, একাকী পদব্রজে ভীষ্মদেবের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে সময় সেই ভাবে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া, বিপক্ষপক্ষ মনে করিল, তিনি অজেয় শত্রুসেনাদর্শনে ভীত হইয়া, যুদ্ধপরিহারপ্রার্থনায় আসিতেছেন। এইরূপে নানা লোকে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রথমেই পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তদীয় পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ভীষ্ম সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—বৎস! যুধিষ্ঠির! আমার নিকট যদি তোমার কোনও প্রার্থনা থাকে, বল! আমি তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিব। যুধিষ্ঠির ভক্তিগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, দেব! বিধিনির্বন্ধে আপনার ন্যায় প্রাণদাতা, চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মহাগুরুর সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধ করিতে হইল। হায়! আমাদের অদৃষ্টলিপি এমনি শোচনীয়! এক্ষণে এ যুদ্ধে আপনি আমাকে অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ দান করুন।

ভীষ্ম স্নেহমধুরস্বরে কহিলেন,—"বৎস! যদি তুমি এ সময় আসিয়া আমার আদেশ গ্রহণ না করিতে, আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইতাম। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার এই গুরুভক্তি ও শিষ্টাচার দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। বৎস! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় হউক। তোমাদের প্রতি আমার প্রগাঢ় স্নেহ সত্ত্বেও আমি কেবল

অন্নদাতা দুর্য্যোধনের অর্থের ঋণ পরিশোধ করিতেই অনিচ্ছায় এ পাপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কেননা, আমি এক্ষণে দুর্য্যোধনের অর্থে প্রতিপালিত। এ জগতে সকলে অর্থেরই দাস ; অর্থ কাহারও দাস নহে (১)। বৎস যুধিষ্ঠির! আমি দুর্য্যোধনের নিকট অর্থ-ঋণে আবদ্ধ। এজন্য আমাকে দুর্য্যোধন-পক্ষেই যুদ্ধ করিতে হইল, আমাকে কাপুরুষের ন্যায় এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু বৎস! ইহা ধ্রুব জানিও,— "যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই ঈশ্বর ; যে পক্ষে ঈশ্বর, সেই পক্ষেই জয়"। অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাক্রমে গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক, আদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারাও ভীষ্মের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্নচিত্তে অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহারাও যে, অন্নদাতার অর্থের ঋণ পরিশোধ করিতেই অনিচ্ছায় এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন ; অনন্তর ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

ভীষ্ম যখন সেনাপতি-পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষেরও অধিক। জরায় "তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল।

(১) "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥"

ভ্রূযুগলের মাংস শ্লথ ও লম্বমান হইয়া তাঁহার নয়নদ্বয়কে আবরণ করায়, তিনি উত্তরীয় দ্বারা ভ্রূযুগলকে ঊর্দ্ধে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। শরীরের মাংস লোল হইয়া পড়ায়, তাহা বর্ম্ম দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন। শুভ্র কেশে ও শুভ্র লোমে তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত; দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন বিশুভ্রা কীর্ত্তি-দেবী তাঁহাকে নিজেরি অনন্যপরায়ণ ভক্ত জানিয়া, শুভ্র-লোম-রূপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া আছেন (১)। কেন না, তিনি অকৃতদার ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া, একমাত্র কীর্ত্তিদেবীকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি দুর্য্যোধনের অনুরোধে যুদ্ধারম্ভে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যে, প্রতিদিন পাণ্ডবপক্ষের দশ-সহস্র রথীকে সংহার করিবেন। তিনি সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ সহস্র চেষ্টায়ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি এ যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবেন না, অর্জ্জুনের সারথ্যমাত্র করিবেন। ভীষ্মেরও প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি কৃষ্ণকে অস্ত্রাধারণ করাইবেন। তিনি দুই দিন অর্জ্জুনের সহিত এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করেন, যে, কৃষ্ণ তখন অস্ত্রধারণ না করিলে, সে মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৈন্যের সহিত অর্জ্জুনকে রসাতলে যাইতে

---

(১) এ দেশের কবিগণ, যশ, কীর্ত্তি ও হাস্যকে শুভ্রবর্ণ ; পাপকে কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্রোধ ও অনুরাগকে রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন।

"মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ" ইত্যাদি। (সাহিত্যদর্পণ।)

হয়। তখন সখাকে রক্ষা করিবার জন্য, কৃষ্ণকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। কৃষ্ণ ভীষ্মবধের জন্য সুদর্শন চক্র তুলিয়া ভীষ্মের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম তখন যুক্তকরে ও ভক্তি গদ্‌গদস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এস! এস! দেব! শীঘ্র আমাকে এ রথ হইতে পাতিত কর। তুমি যে নিজ প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করিয়া এ ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে, ভক্তের মান বাড়াইলে, ইহাতেই আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার মরণে ভয় নাই।" কৃষ্ণ তদীয় অদ্ভুত মহত্ত্ব ও বিনয় দর্শনে লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম লঘুভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেন না, উভয় পক্ষই তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের সামগ্রী। তথাপি তাঁহাকে অজেয় জানিয়া, পাণ্ডবেরা জয়লাভে নিরাশ হন। তাঁহারা বুঝিলেন,—ভীষ্ম জরাজীর্ণ হইলেও, এবং লঘু-ভাবে যুদ্ধ করিলেও এ বীর্য্য-হুতাশনকে নির্ব্বাণ করা অসাধ্য। তখন একদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিশীথে ভীষ্মশিবিরে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম উভয়কে পরম যত্নে ও সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, মধুর সম্ভাষণে আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অর্জ্জুন করযোড়ে কহিলেন,—হে দেব! আমার একটী প্রার্থনা আছে, আপনি তাহা পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলে, শ্রীচরণে নিবেদন করি। ভীষ্ম কহিলেন,—প্রাণাধিক পাণ্ডবগণকে আমার অদেয় কি আছে? আমি কেবল অন্ন-দাতার ঋণমোচনার্থেই এ পাপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অভ্যাগতের প্রার্থনা আমি বিফল করি না। আমি অঙ্গীকার করিতেছি,—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। তখন অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে পিতামহকে কহিলেন,—হে দেব! আপনার হস্তে শস্ত্র থাকিতে, ধর্ম্মরাজের জয়লাভের আশা নাই। ত্রিভুবনে কাহার সাধ্য, আপনাকে পরাজয় করিতে পারে? অতএব ধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনি নিজ মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিন। ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ধনঞ্জয়! আমি যখন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। আমাকে নিপাতিত করিবার জন্য, কল্য তুমি স্ত্রীজাতীয় বীর শিখণ্ডীকে নিজ রথের পুরোভাগে স্থাপন করিও। আমি স্ত্রীজাতির বা ক্লীবাদির উপর শস্ত্রক্ষেপ করি না। শিখণ্ডীকে দেখিয়াই আমি শস্ত্রত্যাগ করিব (১)। তখন

(১) দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী স্ত্রীলোক ছিলেন। অপুত্র দ্রুপদ রাজা পুত্রকামনায় মহাদেবের কৃপালাভ জন্য ঘোর তপস্যা করিয়া, নিজ-পত্নীর গর্ভে এক কন্যা লাভ করেন। শিখণ্ডীই সেই দ্রুপদ কন্যা। কিন্তু দ্রুপদ ঐ কন্যাকে আপন পুত্রসন্তান বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রচার করেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে প্রকৃত ঘটনা গোপন করেন। অনন্তর দশার্ণ-দেশের রাজকন্যার সহিত শিখণ্ডীর বিবাহ দেন। পরাক্রান্ত দশার্ণ-পতি অচিরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, যুদ্ধে দ্রুপদের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতার ঘোর সঙ্কট দেখিয়া কন্যা শিখণ্ডী একাকিনী বিজন অরণ্যে গিয়া, পুরুষত্বলাভের জন্য দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপোবলে পুরুষত্বলাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তাঁহাকে পুরুষ জানিয়া দশার্ণরাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন।

অনায়াসে আমাকে নিপাতিত করিতে পারিবে। অনন্যোপায় অর্জ্জুনকে অগত্যা সেই লোকধর্ম্মবিদ্বিষ্ট ঘোরতর নৃশংস উপায় অবলম্বন করিতে হইল।

অনন্তর পরদিন, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রথের সম্মুখে বসাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণতম শস্ত্রজালে ভীষ্মদেহকে বিধূনিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব শিখণ্ডীকে দর্শনমাত্র শস্ত্র-ত্যাগ করিয়া, নিশ্চলভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট রহিলেন। কেবল একটীবার বলিয়াছিলেন,—"অহো! এ সকল বাণ সাক্ষাৎ বজ্রাগ্নির ন্যায় আমার দেহ দগ্ধ করিতেছে। এরূপ প্রলয়বেগে নিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড ও সাংঘাতিক বাণ শিখণ্ডীর নহে, এ সকল বাণ অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সাক্ষাৎ কালদণ্ড।" অর্জ্জুনের এক একটী বাণ ভীষ্মদেহের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়াছে; এরূপ অসংখ্য বাণ তাঁহার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, দেহমধ্যেই সংলগ্ন হইয়া রহিল। সেই বিশাল দেহে দুই অঙ্গুলি স্থানও অক্ষত ছিল না (১)! গাণ্ডীবীর সুতীক্ষ্ণ

সর্ব্বদর্শী ভীষ্ম এ গূঢ় বৃত্তান্ত জানিতেন। শিখণ্ডী পশ্চাৎ পুরুষত্ব-প্রাপ্ত করিলেও, ভীষ্ম তাঁহাকে স্ত্রীমধ্যেই গণ্য করিতেন। ভীষ্মের ন্যায় ধর্ম্মবীর পুরুষসিংহ স্ত্রীজাতি ও নপুংসক প্রভৃতির উপর অস্ত্রক্ষেপণ করাকে কাপুরুষোচিত কার্য্য মনে করেন। শিখণ্ডীর বিস্তৃত বিবরণ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ১৯০—১৯৫ অধ্যায়।

(১) "ন তস্যাসীদনির্ভিন্নং গাত্রে দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্"।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব)

বাণসকল তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রগাঢ়রূপে প্রোথিত। তাঁহার সেই শরাকীর্ণ বিশাল দেহ রথ হইতে পতিত হইয়া, শরোপরি শয়ান রহিল; সে পবিত্র বীরদেহ আর এ পাপ-পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম নিপতিত হইলে, আকাশ-পাতাল ভেদ করিয়া, সর্ব্বভূতমধ্যে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইল। এই লোমহর্ষণ, ঘোরতর মহাপাপ করিয়া, পাণ্ডবেরা অনুতাপে ও লজ্জায় অধোমুখ হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শরশয্যাশায়ী দেখিয়া, যোগী, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে বলিতে লাগিলেন,—অহো! আজি পৃথিবীর জ্ঞান-সূর্য্য অস্তমিত হইল! বীর্য্য-সিন্ধু বিশুষ্ক হইল! আজি ধর্ম্মের আশ্রয়স্থান শূন্য হইল! ব্রহ্মযোগিগণের ইনিই অগ্রণী এবং ইনিই আশ্রয় ছিলেন (১)।

তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধ পরিহার করিয়া, হাহাকার করত ভীষ্মদেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সজলনয়নে আকুলপ্রাণে রোদন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম উভয় পক্ষকে কাতরভাবে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অলৌকিক ধৈর্য্যবলে নিজ শল্যব্যথা সংবরণপূর্ব্বক, প্রেমার্দ্রবচনে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"প্রাণাধিক বৎসগণ!

(১) "অয়ং ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো হ্যয়ং ব্রহ্মবিদাং গতিঃ।
ইত্যভাষন্ত ভূতানি শয়ানং পুরুষর্ষভম্॥"
(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১১৭ অধ্যায়।)

যদি আমার উপর তোমাদের দয়া থাকে, যদি আমার এ দশা দেখিয়া তোমাদের মনে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি তোমাদের নিকট এই ভিক্ষা চাই, যে, তোমরা এ পাপ-যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; ভাই-ভাই অভেদ্য সদ্ভাববন্ধনে বদ্ধ হইয়া, প্রেমানন্দে পরস্পারের কণ্ঠালিঙ্গন কর। এ জ্ঞাতিবৈর-পাপপঙ্ক আমারি রক্তে ক্ষালিত হউক। আমার প্রাণ-প্রদীপের সঙ্গেই এ বৈরানল নির্ব্বাণ হউক। যদি আজি হইতে তোমরা বিরোধে ক্ষান্ত হও, তবে আমার এ শরশয্যাকে আমি পুষ্পশয্যা জ্ঞান করিব।" কিন্তু আসন্ন-মৃত্যু কৌরবেরা সে মহাপুরুষের অমৃতময়ী উপদেশবাণী গ্রহণ করিল না।

শরশয্যায় পতিত হইয়া ভীষ্ম যখন অসহ্য যাতনা বোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একান্ত ভক্তিযোগে নিমগ্ন হইয়া, তন্ময় হৃদয়ে সর্ব্বদুঃখহারী ঈশ্বরের স্তব করিলেন। ভক্তবৎসল ঈশ্বর, ভক্তের মর্ম্ম ভেদিয়া উত্থিত সেই স্তবের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভীষ্মকে সে নিদারুণ শল্যব্যথা হইতে মুক্ত করিলেন। শান্তিদাতা ভগবানের কৃপায়, ভীষ্ম তখন হৃদয়মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধাবসানে সানুজ মহারাজ যুধিষ্ঠির, সমস্ত আত্মীয়বর্গ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সহিত শরতল্পশায়ী পিতামহের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার জন্য গমন করিলেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের—মৈত্রী

ও করুণার মূর্ত্তি,—শৌর্য্য ও বীর্য্যের অপ্রমেয় আধার,—ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও শান্তিধর্ম্মের নিকেতন,—পরোপকার, আত্ম-ত্যাগ ও নির্ব্বিকারতার নিরুপম আদর্শ, সেই নির্ব্বাণোম্মুখ ধর্ম্ম-বীরের নিকট দুর্ল্লভ ধর্ম্মরহস্য শ্রবণ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া, নানা দেশের ও নানা আশ্রমের অসংখ্য সাধুগণ তথায় মিলিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম, এই তিন বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ঈশ্বরে আত্মা সমাহিত করিয়া, ধর্ম্মরাজের সে সকল জটিল ও কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর দান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের সে সকল উত্তর, অশেষবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচিত্র ইতিবৃত্ত ও আখ্যানাদি দ্বারা বিশদীকৃত। বস্তুতঃ সেরূপ আশ্চর্য্য ও অমূল্য জ্ঞানরত্নরাশির একত্র সমাবেশ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সেই সকল সুধাময় সুভাষিত, "শান্তি-পর্ব্ব" নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের 'ভগবদ্গীতা' ও 'শান্তিপর্ব্ব', এই দুটী, ব্যাসের কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ। ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে অটল থাকিয়া, একান্তভাবে সাধনা করিলে, এই আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-সমাকুল জীবলোকে মানব যে, সর্ব্বদুঃখের অতীত হইয়া, মৃত্যুর উপরেও প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, এ কথা ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের জীবনে প্রমাণীকৃত (১)।

(১) "ইচ্ছামৃত্যু"—নবযৌবনে, ভীষ্ম পিতার সুখের জন্য

সেই বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষ এইরূপে বিশ্বজনীন জীবনব্রত সমাপন করিয়া, নিজ ভৌতিক দেহের বিলয়-কামনায় মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। যোগবলে একে একে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হইল। তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর বিশল্য, ও বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি-জ্যোতি উদ্ভাসিত। বিস্ময়ে ও ভক্তিভরে স্তম্ভিত হইয়া, অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অমর আত্মা, তদীয় ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া, সচ্চিদানন্দ দিব্যধামে প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ বিস্মিত দর্শকমণ্ডলীর গগনভেদী সাধুবাদ উত্থিত হইল।

কুরুবংশের অকলঙ্ক চন্দ্রমা ভীষ্মদেব, পুণ্যময় চরিত্র-প্রভায় ভুবনমণ্ডল আলোকিত করিয়া, পাপতাপদগ্ধ জীবলোকের নিমিত্ত অক্ষয় শান্তিসুধার খনি—"শান্তিপর্ব্ব" উদ্‌ঘাটিত করিয়া, অস্তাচলে গমন করিলেন। তাঁহার পার্থিব দেহ বিলয়প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহার অপার্থিব, অনশ্বর কীর্ত্তি-দেহ লোকহৃদয়ে অনন্তকাল দীপ্যমান থাকিবে।

যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহ না করিয়া, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে অঙ্গীকার করায়, তাঁহার পিতা শান্তনু তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে মৃত্যুকামনা না করিলে, তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

ভীষ্মের শরশয্যা।

রয়েছে অসংখ্য বাণ দেহ ভেদ করি,
ভূমি না পরশে দেহ আছে শরোপরি।
দহিছে কালাগ্নিসম পার্থ-শরানল,
তথাপি প্রফুল্ল তাঁর বদনকমল।
ছিন্ন ভিন্ন মর্ম্মস্থান নাড়ী-সমুদয়,
তথাপি অম্লান কান্তি, অক্ষুব্ধ হৃদয়।
প্রগাঢ় শোণিতে লিপ্ত ভীষ্ম-কলেবর,—
যেন অস্তাচলগামী লোহিত ভাস্কর।
শান্তিময় মহাযোগে আত্মা নিমগন,
প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, নিশ্চল লোচন ;
গভীর তরঙ্গশূন্য সমুদ্র-সমান,
অলক্ষ্যে অন্তরে উঠে প্রেমের তুফান।
যে পার্থ সর্ব্বাঙ্গ তাঁর বজ্রসম শরে—
বিন্ধিলা অধর্ম্ম করি' অন্যায় সমরে,
সেই পার্থ আদি যত পাণ্ডব, কৌরব,
ঘেরিয়া রয়েছে তাঁরে হইয়া নীরব।
সাদরে মধুরস্বরে করি' সম্ভাষণ,
সবারে বলেন বাণী শান্তনুনন্দন,—
"ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র জগতে পূজিত,
জ্ঞাতি-বন্ধু-রক্তে আজি হইল প্লাবিত।

এ ভীষণ ভ্রাতৃবৈর কালাগ্নি-সমান।
আমার প্রাণের সঙ্গে হউক নির্ব্বাণ।”
শুনান সবারে ভীষ্ম শান্তিধর্ম্ম-কথা,
যা শুনিলে দূরে যায় শোক-মৃত্যু-ব্যথা।
হেরি তাঁরে চমকিত সুরসিদ্ধগণে
আচ্ছাদিছে শরশয্যা পুষ্পবরষণে।
ধন্য! ধন্য! ভীষ্মদেব! শান্তনুনন্দন!
ধন্য ধন্য দেবব্রত! পতিতপাবন!
পিতার সুখের তরে তুমিই যৌবনে—
সর্ব্বত্যাগী হয়ে ছিলে অম্লান বদনে।
ক্ষত্রকুল-কালরাত্রি অজেয় ভার্গব—
তব সনে সমরে মানিল পরাভব (১)।
ধৈর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঈশ্বর ভকতি,
বর্ণিবারে পারে তব কাহার শকতি?
শরশয্যামাঝে তুমি দিয়াছ যে জ্ঞান,
অনন্ত জীবের তাহা অক্ষয় কল্যাণ।
জরায় মুমূর্ষু কালে যে বীর্য্য তোমার!
দীপ্ত সূর্য্য ম্লান হয় প্রভাবে তাহার।

---

(১) ‘ভার্গব’—পরশুরাম। পরশুরামের সহিত ভীষ্মের দীর্ঘকাল-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে পরশুরাম পরাজিত হন।
(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব, অম্বোপাখ্যান-পর্ব্ব দেখ।)

ইন্দ্রিয়সংযমে আর সত্যের রক্ষণে,
তুলনা মিলে না তব এ তিন ভুবনে।
তোমা হেন আত্মত্যাগী কে আছে সংসারে ?
এত ধৈর্য্য, এত ক্ষমা কে দেখাতে পারে ?
বিশ্বজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়, দয়ার আধার,—
হেন বীর কে দেখেছে কে শুনেছে আর ?
ব্রহ্মবিদ্যাদানে তুমি যোগিকুলগুরু,
সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা তুমি জ্ঞানকল্পতরু।
সমগ্র ভুবন পূর্ণ তব মহিমায়,
ভীষ্মদেব ! মহাদেব ! নমি তব পায়।
শান্তিদানে জীবলোক করিতে নিস্তার,
আপনি এ শরশয্যা করিলে স্বীকার !

সতীধর্ম্ম।

(মহাভারতের কথা।)

দেবলোকে সুমনা-শাণ্ডিলী-সংবাদ।

রমণী শাণ্ডিলী নামে সর্ব্বজ্ঞানাধার
অক্ষয় অমরধামে করেন বিহার।
একদা সুমনা নামে দেবাঙ্গনা সনে।
সাক্ষাৎ হইল তাঁর অমর-ভবনে।
শাণ্ডিলীরে জিজ্ঞাসিলা সুমনা সুন্দরী,—
কল্যাণি! কি পুণ্যে তুমি এলে সুরপুরী?
বিধূম-পাবক-শিখা-সম তব কায়—
উজলিছে দেবলোক অপূর্ব্ব প্রভায়!
চন্দ্রকন্যাসমা তুমি অমলমূরতি,
শোভিছ সহস্রগুণে দেব-রথে সতি!
জ্যোতির্ম্ময় বেশ তব, নাহি কোনো তাপ,
নিত্যানন্দে মগ্ন তুমি নির্ম্মল নিষ্পাপ।
অল্প তপস্যার ফল নহে এ সম্পদ,
বল! শুনি কিবা পুণ্যে লভিলে এ পদ?
শাণ্ডিলী সুমনা-বাক্য করিয়া শ্রবণ,
সহাস্যে তাঁহারে ক'ন মধুর বচন,—

রক্তবস্ত্রপরিধান, মস্তকমুণ্ডন,
তীর্থদরশন, জটাবল্কল-ধারণ,
করি নাই এ সকল, শুন! যে কারণে
এ হেন ঐশ্বর্য্য মোর অমর-ভবনে,—
অতি সাবধানে পতি করেছি সেবন,
কহি নাই কভু তাঁরে অপ্রিয় বচন।
শ্বশুর-শাশুড়ী-দেব-অতিথি-সজ্জনে
সেবিয়াছি সাবধানে ভক্তিপূর্ণ মনে।
জানি নাই কভু আমি খলতা কেমন,
বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া না ছিনু কখন;
বাচালতা, প্রগল্‌ভতা, চাপল্যপ্রকাশ,
অথবা গর্হিতভাবে হাস্য-পরিহাস,
মনে জ্ঞানে কারো কোনো অহিতাচরণ,
জীবন ধারণে করি নাই কদাচন।

বাহির হইতে পতি আসিলে ভবনে,
পূজিতাম সযতনে বসায়ে আসনে।
যে ভক্ষ্যে যে ভোজ্যে রুচি না হইত তাঁর,
আমিও সে সব করিতাম পরিহার।
যে কোন সামগ্রী গৃহে আসিত যখনি,
রাখিতাম যথাস্থানে গুছায়ে তখনি।
গৃহকার্য্য সমুদায় প্রত্যূষে উঠিয়া
করিতাম সাবধানে আলস্য ত্যজিয়া।

পরিবারে যাহার কর্ত্তব্য ছিল যাহা,
যথাকালে যথাবিধি করা'তাম তাহা।
পতি যদি কার্য্যবশে যেতেন বিদেশে,
থাকিতাম গৃহে সদা তাপসীর বেশে;
নানা সুমঙ্গল কার্য্য পতির কল্যাণে—
করিতাম সদা আমি বিবিধ বিধানে;
বেশ, ভূষা, অঙ্গরাগ, স্নানানুলেপন,
এ সকল সে সময় করেছি বর্জ্জন।
পতি যবে নিদ্রা যাইতেন অকাতরে,
ভাঙ্গি নাই নিদ্রা তাঁর কোনো কার্য্যতরে।
পরিবারে আবশ্যক দ্রব্যের কারণ,
করি নাই কভু আমি পতিরে পীড়ন।
বিলাসিতা-অভিমান নাহি ছিল মনে,
বৃথা অর্থব্যয় মোর না ছিল ভবনে।
বিন্দু বিন্দু দিন দিন করিয়া সঞ্চয়,
হরিতে দীনের দুঃখ করিতাম ব্যয়।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত না করেছি কদাচন,
প্রাণপণে পতি-চিত্ত করেছি রঞ্জন।
মম গৃহে পশু-পক্ষী আদি জীবগণ,
সুপালনে ছিল সদা পুলকিতমন।
অশেষ ক্লেশের ভার করিয়া বহন,
হরিতে আশ্রিতদুঃখ করেছি যতন।

সদা পরিষ্কৃত মম থাকিত ভবন,
পবিত্র পানীয়, শয্যা, অশন, বসন ;
অশুচির নামগন্ধ না ছিল ভবনে,
পালিয়াছি গৃহধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে।
ভগবানে অন্ন-পান করি' নিবেদন,
ভোজন করায়ে তাহে অতিথি-স্বজন,
ভোজন করায়ে দাস-দাসী-পরিজন,
সর্ব্বশেষে করিতাম আপনি ভোজন।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত জীবে দিতে অন্ন-পান,
করিবারে শোকার্ত্তের শোকের নির্ব্বাণ,
ভয়ার্ত্তে অভয়-দানে, আতুর-সেবায়,
কদাচ অলস কেহ দেখেনি আমায়।
ভগবানে কর্ম্মফল করিয়া অর্পণ,
সুসংযমে গৃহধর্ম্ম করেছি পালন।
যে নারী এ সতীধর্ম্ম করয়ে পালন,
পতিপদে সমাহিত সদা যার মন,
অরুন্ধতী-সম তারে অমরনিকরে (১)
সনাতন স্বর্গধামে নিত্য পূজা করে।*

---

(১) 'অরুন্ধতী'—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি সতীকুলের আরাধ্যা দেবতা। "অরুন্ধতীসমাচারা ভব" বলিয়া, নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

সমাপ্ত।